ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১ সংখ্যা ।। ৩১ শ্রাবণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৭ আগস্ট, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com ।। পনেরো আগস্ট সংখ্যা।।

খৃস্টান স্কুলের হোস্টেলে ছাত্রদের গো-মাংস খাওয়ানো হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা, বীরভূম ।। খৃস্টান পরিচালিত স্কুল হোস্টেলের খাবারে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের গো-মাংস খাওয়ানো হচ্ছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী স্কুল ও হোস্টেল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ-জনতা খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু রক্ষা মঞ্চ জেলার সদর মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেয়।

অবরোধের ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ আগস্ট বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ির ভট্টাচার্য পাড়ায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট জেভিয়ার্স-এর শাখা প্রতিষ্ঠান বলে পরিচয় দিয়ে শহরের পুর এলাকায় ১৪ নং ওয়ার্ডে একটি কলকাতার খৃস্টান মিশনারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এবছর চলতি শিক্ষাবর্ষে শুরু হয় সিউড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। উদ্বোধনের দিন চার্চের পাদ্রি এনে বাইবেল পাঠ করে শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক দিলীপ গাঙ্গুলী, জেলা সভাধিপতি অন্নপূর্ণা মুখার্জি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মনোনীত বিধায়ক ব্যারি ও ব্রায়েন ফলাও করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে। কিন্তু তার কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের উলঙ্গ চেহারা প্রকাশিত হয়। অভিযোগ, গত সপ্তাহে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভট্টাচার্য পাড়ায় অবস্থিত স্কুল-হোস্টেলের রাঁধুনী উজ্জ্বলা কাহারকে গো-মাংস রান্না করতে বলেন হোস্টেলের খাবার সাপ্লায়ার কাজল সেখ। ওই মহিলা প্রতিবাদ করে কাজ ছেড়ে দেয়। উজ্জ্বলাদেবীর অভিযোগ, হোস্টেলে শুধু গো-মাংস খাওয়া নয়, নানা অসাধু কাজকর্ম হচ্ছে স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল-এর মদতে। তারই প্রতিবাদে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহে স্থানীয় বাসিন্দারা হোস্টেলের গেটে গো-মাংস ঢুকতে দেখে বিক্ষোভ শুরু করে। হোস্টেল ক্যাম্পাসে এলাকাবাসীরা ঢুকতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের খাবারে ছাগল বা মুরগীর মাংসের বদলে অন্যায়ভাবে গো-মাংস রান্না করে শিশু কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা সিউড়ি-সাঁইথিয়া রোড অবরোধ করে। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে অবরোধ চলে। পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে শুরু হয় খন্ড যুদ্ধ।

স্থানীয় বাসিন্দা অশোক ধীরব, শ্যাম ধীবরদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে হোস্টেলে ছাগলের মাংসের বদলে গো-মাংস রান্না করে বাইরে থেকে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আজ হাতে-নাতে ধরতে পেরেছি। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, আগামী দিনে আর তা হবে না।

এই ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে সদর

(এরপর ৪ পাতায়)

সংবাদমাধ্যমে ইলিশের খবর থাকে, হিন্দু নারী ধর্ষণের নয়

বাংলাদেশে হিন্দুরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক

গুঢ়পুরুষ ।। বাংলাদেশে হিন্দু নারী নির্যাতন ও জোর করে ধর্মান্তরকরণের অসংখ্য নৃশংস ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। অথচ প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজে তা নিয়ে বিশেষ হেলদোল নেই। কলকাতার বাংলা খবরের কাগজে বাংলাদেশের ইলিশ মাছের খবর ছাপা হলেও সেখানের হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার মতো নৃশংস ঘটনাগুলি অপ্রকাশিত থাকে। কলকাতার সংবাদমাধ্যমের পরিচালকদের বক্তব্য, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও ধর্মান্তরকরণের ঘটনাবলী প্রকাশিত হলে এপার বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। তাই এপার-ওপার দুই বাংলায় হিন্দুরা অত্যাচারিত হলেও খবর চাপা দেওয়া হয়। অথচ জম্মু-কাশ্মীরে সম্প্রতি দুই মুসলিম মহিলার ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় গোটা রাজ্যই বিক্ষোভ ও হিংসায় উত্তাল হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা অচল করে দেওয়া হয়েছে। জনরোষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে আত্মরক্ষার্থে ইস্তফার নাটক করতে হয়েছে। সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন সেইসব খবর ফলাও করে প্রচার করেছে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন অবশ্যই ঘৃণ্যতম অপরাধ। কিন্তু শুধু মুসলিম পরিবারের নারী ধর্ষিতা হলে নিন্দা ও প্রতিবাদে সংবাদমাধ্যম মুখর হবে। হিন্দু নারী ধর্ষিতা ও খুন হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হবে না, এমন আজব নীতি আমাদের সংবাদমাধ্যম অনুসরণ করবে কেন সেই কৈফিয়ৎ চাওয়ার সময় এসেছে।

বাংলাদেশে গত জুন ও জুলাই মাসে তিনটি হিন্দু নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ এবং খুনের ঘটনা উল্লেখ করছি। এই তিনটি ঘটনাই ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। মাদারিপুরের রাজৈর এলাকায় অঙ্গুরি বিশ্বাস তাঁর স্বামী মন্টুলাল বিশ্বাস ও চার

গণধর্ষিতা চার হিন্দু নারী। (ফাইল চিত্র)

বছরের সন্তান শিমুল সুখে শান্তিতে বাস করতেন। গত ২ জুলাই স্থানীয় মুসলিম গুন্ডা সেকেন্দার শিকদারের নজরে পড়ে অঙ্গুরি। সেকেন্দার তার দুই সাগরেদ শানু ও বসিরকে নিয়ে প্রকাশ্যে দিনের বেলা বাড়ি থেকে অঙ্গুরিকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় অঙ্গুরির স্বামী তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। অঙ্গুরির আর্তনাদে তাঁর প্রতিবেশী মুসলিম পরিবারের মানুষজন প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি। অঙ্গুরির স্বামী স্থানীয় থানায় স্ত্রী অপহরণের ঘটনার অভিযোগ জানাতে গেলে রাজৈরি থানার অফিসার মোকাররম হোসেন ২০,০০০ টাকা ঘুষ চায়। শেষ পর্যন্ত ৫০০০ টাকা ঘুষ নিয়ে অভিযোগ লেখে। ওই পর্যন্তই। অঙ্গুরিকে উদ্ধারে কোনও সাহায্যই পুলিশ করে না। বাধ্য হয়ে মন্টুলাল বিশ্বাস মাদারিপুর আদালতে তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। আদালতের নির্দেশে রাজৈরি থানা নড়েচড়ে বসে। পুলিশ আদালতে জানায় যে অঙ্গুরি 'স্বেচ্ছায়' ইসলাম কবুল করেছে এবং সেকেন্দারের বিবি হয়েছে। এই সেকেন্দারের বিরুদ্ধে নরহত্যা, ডাকাতির মামলা চলছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঢাকা ডিভিসনের অন্তর্গত শাহরিয়াতপুর জেলার দক্ষিণ গোয়ালদিয়া গ্রামের। এখানেই নববিবাহিতা রাধারাণী তাঁর স্বামী দীপঙ্কর বৈরাগীর সঙ্গে বাস করতেন। অভাবের সংসারে কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে রাধারাণী স্থানীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার জন্মস্থান আজও উপেক্ষিত

সৌমেন নিয়োগী ।। ভারতে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ছিলেন এমনই এক মনীষী, যাঁর অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতমাতার স্বনামধন্য সেই কৃতী সন্তানের জন্মস্থান গুজরাটের মান্ডভি-তে। আমরা ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের সদস্যরা সেই স্থান দর্শন করে নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করি। পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা জন্মেছিলেন গুজরাটের 'কচ্ছ' জেলার অন্তর্গত আরব সাগর নিকটবর্তী 'মান্ডভি' নামে একটি ছোট্ট জনপদে। বর্তমানে মান্ডভি অবশ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। গুজরাটে ভ্রমণকারীরা সকলেই জাতির জনক গান্ধীজী ও সবরমতী আশ্রম দেখতে যান। অথচ এই প্রদেশে এমনই এক মহাপুরুষের জন্মস্থান যা আজ অত্যন্ত উপেক্ষিত। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা আপন প্রতিভার গুণে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ঐতিহ্যের গৌরবগাথাকে পরাধীন জাতির জনসম্মুখে উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য ভারতীয় সভ্যতার হারানো অতীতকে জাতীয় চেতনার বিকাশে রূপ দিয়েছিল। দারিদ্র্য ও বিভিন্ন অসুবিধাকে অতিক্রম করে তিনি বিলেতে গিয়ে 'ইন্ডিয়া হোম' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই যুগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিদেশের মাটিতে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অসাধারণ জনসংযোগকারী ও জনজাগরণ পত্রিকা 'India Sociology'। যার অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। এমনই স্বনামধন্য স্বাধীনতা যোদ্ধার বাসস্থান ও জন্মভিটে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এক অপার্থিব তীর্থক্ষেত্র। ভুজ থেকে প্রায় ৮০ কিমি দূরে অবস্থিত মান্ডভি। ১৪ মার্চ ২০০৯ আমরা খুব সকালে গান্ধীধাম থেকে মান্ডভির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পথে আমরা আম্বাজীর মন্দির দর্শন করি। স্থানীয়রা জানতে চাইলে আমরা মান্ডভির কথা অর্থাৎ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা বলি। আমাদের কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন, কারণ সেখানকার স্থানীয়রাও সেই স্থানে কদাচিৎ গিয়ে থাকেন। অবশেষে সেই ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। পাশের প্রতিবেশীর সহযোগিতায় তাঁর

(এরপর ৪ পাতায়)

জন্মকক্ষে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও তাঁর পত্নীর ছবি। নীচে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ভস্মাধার।

৬২ বছরে স্বস্তিকার শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬২ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। —স্বস্তিকা পরিবার

এই সংখ্যায় —

জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর একান্ত সাক্ষাৎকার ..... পৃঃ ২
শ্রী অরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণের শতবর্ষ উপলক্ষে সেই ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বয়ান ..... পৃঃ ৮-৯
অখণ্ড ভারত ভাবনা যে অপ্রাসঙ্গিক নয়, তা নিয়ে লিখেছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়..... পৃঃ ১৩
সনাতন ধর্ম ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন — লিখেছেন ডঃ প্রীতিমাধব রায় ..... পৃঃ ৩
চীনের আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন - মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় .....পৃঃ ৭
দেশভাগের ব্যাপারে গান্ধীজীরও যে সম্মতি ছিল তা নিয়ে লিখেছেন ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত। ..... পৃঃ ৬

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

সাক্ষাৎকার ঃ জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী

সাদাকালো নয়, বর্তমান যুগে সব সম্পর্কই ধূসর

স্বাধীনতার পর পার হয়ে গেছে প্রায় সওয়া ছয় দশক। স্বাধীনতালগ্নে দেশভাগ বাঞ্ছিত না হলেও, স্বাধীনতা লাভ করেছিল ভারতবাসী। স্বাধীন ভারতের মাত্র বাষট্টি বছরের জীবনে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঝড়-ঝাপটা বড় একটা কম হয়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসমসাহসিকতা সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও ভারতবাসীকে দিয়েছে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে বাঙালীর বীরত্ব, স্বাধীনতা উত্তর যুগে কেরিয়ার-মুখীনতার কারণে বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে গেলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বাঙালীর বীরত্বের সেই প্রবহমানতার দুই সেনানায়ক জয়ন্ত চৌধুরী ও শঙ্কর রায়চৌধুরী। দু'জনেই ছিলেন সেনাবাহিনীতে, মূলত স্থলবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে। মিলিটারী ভাষায় যাকে 'জেনারেল' বলা হয়। জেনারেল থাকাকালীনই মারা যান জয়ন্ত চৌধুরী। বহুদিন হল অবসর নিয়েছেন শঙ্কর রায়চৌধুরী। ইদানীং স্বস্তিকার পাঠকরা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। তাঁদের উদ্বেগ কাটাতেই ফোনে ধরা হয়েছিল তাঁকে। বহু ব্যস্ততার মধ্যেই স্বস্তিকাকে আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাড়িতে। নিজের ড্রয়িংরুমে বসে দিলেন এক সাক্ষাৎকার। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, 'স্বস্তিকার একটা বিশেষ চিন্তাধারা রয়েছে'। সেই সাক্ষাৎকারের একটি ধারাবিবরণী দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছে স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ। ছবি তুলেছেন বাসুদেব পাল।

❑ এই মুহূর্তে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতের প্রধান শত্রু এখন কে, তবে কার নাম বলবেন?

● এভাবে আমি কারুকেই চিহ্নিত করতে চাইব না। তবে পাকিস্তান তো আছেই। সেটা না বললেও চলে। ভারতবর্ষকে আজকের জগতে নিরাপত্তার কথা ভেবেই রাজনৈতিকভাবে এগোতে হবে। কারণ নিরাপত্তার ভিত্তিটা হচ্ছে রাজনৈতিক; অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক। সেই জন্য একেকটা স্লোগান দেওয়া অমুক শত্রু-অমুক বন্ধু; সেটা বোধহয় এখন আর ঠিক যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবুও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা ১৯৪৭ সাল থেকেই আছে। পাকিস্তান কথাটা কিন্তু ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখতে হবে। কারণ পাকিস্তানের নানা রূপ আছে।

একটা হল পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার অর্থাৎ যাতে পাক-প্রেসিডেন্ট জারদারী, পাক-প্রধানমন্ত্রী গিলানি আছেন। এঁরা সিংহাসনে আছেন, কিন্তু রাজত্ব করছেন না। এঁদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, অর্থাৎ ভারতের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে পুরো দায়িত্বে কিন্তু রয়েছে পাক-সেনাবাহিনী। এটা পাকিস্তানের আরেকটি রূপ। ভারতের সাথে পাকিস্তানের কি কি সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত; কাশ্মীর, দ্বিতীয়ত, পরমাণু অস্ত্র; তৃতীয়ত, জেহাদ ও চতুর্থত, আফগানিস্তান। — এই চারটিরই দেখভাল কিন্তু করছে পাক-সেনাবাহিনী। সুতরাং এখানে আমি যে পাকিস্তানের কথা বলছি, পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে সেটা পাক-সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে বলছি। এরা আমাদের সহ্য করতে পারে না। তাই এই পাকিস্তান (নির্বাচিত সরকার ও পাক সেনাবাহিনী)-এর ভাগাভাগিটা আপনারা কীভাবে করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার।

কিন্তু জেনে রাখুন, এই পাকিস্তান সেনাবাহিনীই কিন্তু আমাদের মূল শত্রু।

তবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রেক্ষিতে এই যে লেবেল — 'শত্রু', 'বন্ধু' এগুলি কিন্তু আর খাটে না। যখন দরকার তখন বন্ধু হয়, যখন দরকার হয় না তখন শত্রু হয় বা নির্দল থাকে। প্রতিটা দেশই নিজের স্বার্থ দেখে। আমাদেরও তাই করা উচিত।

❑ এই প্রেক্ষাপটে আরেকটা প্রশ্নও উঠে আসছে। তালিবানদের সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর যুদ্ধটাকে আপনি তবে কীভাবে দেখবেন?

● একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, পাক সেনাবাহিনী বেছে বেছে তাদেরই বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, যে তালিবানরা পাক-অভ্যন্তরে সন্ত্রাস কায়েম করছে। যেমন; বায়তুল্লা মাসুদ, মোল্লা ফজুল্লা ইত্যাদি এরকম অনেক লোক রয়েছে। তাও রয়ে সয়ে নিজেদের স্বার্থে পাক-সেনাবাহিনী এটা করছে। কিন্তু যে তালিবানরা পাকিস্তানে থাকে কিন্তু আক্রমণ করছে আফগানিস্তানে অর্থাৎ আমি আলাউদ্দিন কুলকার্ণী, সিরাজ হাক্কানি, মোল্লা ওমরদের কথা বলছি; এদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কিন্তু পাক-সেনাবাহিনী নিচ্ছে না।

সুতরাং বলাই যায়, তালিবানদের সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর যুদ্ধটা কিন্তু পাকিস্তানের স্বার্থেই।

(এরপর ১০ পাতায়)

Glorious History..
Brighft Future

PROUDLY CO-OPERATIVE

1st Co-Operative Bank in Gujarat to offer 100% Relief in Interest to Small & Regular Borrowers with Limits up to 25 Thousand.

- 26 Branches in 15 Cities including Gandhidham - Mumbai
- Tatkal (Ready) Finance up to Rs. 2 Lacs.
- Demat services available at minimum cost.
- Maximum possible Dividend to All Share Holders every year
- Saurashtra's First & Only Multi-state Scheduled Co-Operative Banks.
- Free Drafts (Without Commission) on Bank's Own Branches.
- Various Loan Schemes including Vehicle Loan, Loan against Property, Business & Industrial Loan, Educational Loan, Personal Guarantee Loan, Gold Loan*, Loan against NSC* & Government Securities*
- Stamp Vending of Non-Judicial Stamp Paper (Franking Machine)
- Life & Non-Life Insurance Services available through tie-up with Leading Companies.
- A force of 500 Hardworking, loyal, dedicated employees.

RESULT

RAJKOT NAGARIK SAHKARI BANK LTD.
(MULTI STATE SCHEDULED BANK)

SURESH MOTIANI — GENERAL MANAGER
TAPUBHAI LIMBASIYA — VICE CHAIRMAN
KALPAKBHAI MANIAR — CHAIRMAN

H.O. & Reg. Office : Nagrik Bhavan No. 1,
Late Shree Janmashankar Antani Chowk, Dhebarbhai Road, Rajkot-1.(Gujarat)
Phone : (0281) 2233916/17/18 Fax : (0281) 2223933

(*Limited Branches)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বায়ু দূষণ? না, টাটা-বিড়লা তোষণ?

কিছুদিন ধরিয়া বায়ু দূষণের নামে শুরু হইয়াছে কলকাতার যাত্রী পরিবহন বন্ধ করিবার মহাঅভিযান। পনের বছরের পুরাতন যাত্রী পরিবহন নাকি বায়ু দূষণ করিতেছে। চৌদ্দ বছরের পুরাতন হইলে কি বায়ু দূষণ করিবে না? নাকি টাটা-বিড়লার নিকট হইতে সদ্য ক্রয় করা বাস-ট্যাক্সি হইতে একেবারে বায়ু দূষণ হইবে না?

সত্য বলিতে কী যাত্রী পরিবহন যান হইতে বায়ু দূষণ হয় না। বায়ু দূষণের মূল কারণ পেট্রল-ডিজেল প্রভৃতি জ্বালানী তেল। জ্বালানী তেলের উপাদান এমন এক প্রকার পদার্থ যাহা আমাদের শরীরে প্রবহমান রক্তের স্রোতকে ব্যাহত করে এবং এর ফলস্বরূপ মানবদেহে অনেক ধরনের মারণ ব্যাধি বাসা বাঁধে। পূর্বে এই বিষয়ে সারা বিশ্ব জুড়িয়া বহু আলোচনা সেমিনার প্রভৃতি হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী উত্তাপ বৃদ্ধি র পিছনে এই জ্বালানীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আলোচনা ব্যতিরেকে এই জ্বালানী সংশোধনের কিছু সুরাহা হইয়াছে ইহা হলফ করিয়া বলা যায় না। তাই সব ব্যাটাকে ছাড়িয়া বেড়ে ব্যাটাকে ধরিয়াই টানাটানি শুরু হইয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ এই দূষণ। শুধু বায়ু দূষণ কেন শব্দ দূষণও তো এক প্রকার দূষণ। এই শব্দ দূষণের বিরুদ্ধেও আদালতের রায় আমরা জানি। কিন্তু আদালতের রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের যত সক্রিয়তা আমরা দেখিয়াছি তাহা কেবল অসংগঠিত হিন্দুদের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই। বাণিজ্যিক প্রাত্যহিক পত্রিকাগুলিও ততোধিক সক্রিয় এই ব্যাপারে। সংগঠিত ও আগ্রাসী মুসলমানদের ইসলামের নামে শব্দ দূষণের ব্যাপারে তাহারা সকলেই মুখে কুলুপ আঁটিয়া বসিয়া থাকে।

বামপন্থীরা এবং তাহাদের নয়নের মণি ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই করা যাউক না কেন, তাহারা যে আদালতের রায়কে বাধ্য ছেলের মতো পালন করিয়া থাকে — এই অভিযোগ কিছুতেই করা চলে না। ইহার উদাহরণ অগণিত। গরীব অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সরকরি কর্মচারীদের পেনশন এবং অন্যান্য পাওনা-গন্ডা মিটাইতে আদালতের রায় অমান্য করিয়া জরিমানা দেওয়ার ঘটনা এই রাজ্যে অনেক।

তাই আজ যে তাহারা আদালতের নির্দেশ কার্যকর করিতে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ কি? কেননা ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই যে ভয় পাইবে, ইহা তো স্বাভাবিক। তাই আশঙ্কা হয় এবারে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করাটা ছলনা নয় তো? আদালতের মূল বিবেচ্য বায়ু দূষণ বন্ধ করা। ইহার পিছনে কী রাজনীতি আছে তাহা বিবেচনা করাটা আদালতের কাজ নয়। আদালত তাহা করিতেছেও না। ইহাই হইয়াছে বামফ্রন্ট সরকারের মোক্ষম অস্ত্র। সামনে বায়ু দূষণ পিছনে টাটা-বিড়লা তোষণ। গত কয়েক বছর ধরিয়াই টাটা-বিড়লা যাত্রী পরিবহনের বাস-ট্যাক্সি উৎপাদন প্রায় শূন্যে নামিয়া গিয়াছিল। তাই টাটা অন্য ধরনের প্রাইভেট গাড়ি তৈয়ারির দিকে ঝুঁকিয়াছিল। বিড়লায় শুরু হইয়াছিল কর্ম-বিরাম। তাহার পর গত বছরের ওই আর্থিক সঙ্কট। সরকার কোটি কোটি টাকা অনুদান দিয়াছিল এই পুঁজিপতিদের। কিন্তু গাড়ির চাহিদা না বাড়িলে উৎপাদন করিয়া কি হইবে? গাড়ির বাধ্যতামূলক চাহিদা বাড়াইবার জন্যই কি এই পরিকল্পনা? আর অন্যদিকে ব্যাঙ্ক ঋণ লওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঋণ দেওয়া বন্ধ হইলে ব্যাঙ্ক চলিবে কি করিয়া? ব্যাঙ্কের আয়ের এইটাই একমাত্র পথ। তাই ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দেওয়ারও বন্দোবস্ত হইল। এক ঢিলে অনেক পাখী মারিবার কী সুন্দর কৌশল।

এই কয়দিনেই যাত্রী পরিবহনের অভাবে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। বায়ু দূষণ দূরীকরণের আদর্শ পথ গোরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়া যাওয়া। জনগণ যদি এই দাবী করেও, বাম নেতাদের তাহা মানিবার উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে টাটা-বিড়লাদের কী হইবে? যে কোনও রকমের দূষণ রোধ অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু কোনও মতলব হাসিল করিবার জন্য তাহা করিতে যাইলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। চালাকির দ্বারা যে কোনও মহৎ কার্য হয় না — এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অজানাকে জানা এবং যে পথে কেউ কোনও দিন চলেনি সেই পথে চলার আকর্ষণের চেয়ে অন্য কোনও আকর্ষণ আমার জীবনে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। অনিশ্চি ত এই জীবনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে — আবার এখানে আনন্দও আছে। এখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কালখণ্ড যেমন আছে তেমনই আবার ঊষাকালের আলোর সম্ভাবনাও আছে। এই দুর্গম পথে চলবার জন্যই আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাই।

— সুভাষচন্দ্র বসু (ভারত পথিক)

স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম

ডঃ প্রীতিমাধব রায়

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস, আবার ওই দিনটিই হলো শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। এই বিচিত্র সমাপতন ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সূচিত করে। ১৫ আগস্ট বৃটিশ সরকার খণ্ডিত ভারতের শাসনভার ভারতের কিছুলোকের হাতে দিয়েছেন। তার আগেই অবশ্য আমাদের মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গকে ত্রিধা বিভক্ত করে পশ্চি ম ও পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই রাত্রে আমরা কিশোর, বড়দের দেখাদেখি কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম আনন্দোৎসব করতে। দিল্লী থেকে জওহরলাল নেহেরু আবেগময় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ঠিক তখনই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য যাবতীয় পার্থিব সম্পদ তাঁদের পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান পাকিস্তানে ফেলে ভারতের পথে যাত্রা করেছেন। সবকিছু ফেলেও যে নিরাপদে ভারতে এসে পৌঁছাবেন তার কোনও স্থিরতা নেই। ট্রেন ভর্তি করে আসছে হিন্দু ও শিখদের মৃতদেহ, যাঁরা হাঁটাপথে আসছেন, তাঁদের উপর সশস্ত্র হামলা হচ্ছে। রক্ষাকারী পাঠান, বালুচ, পাঞ্জাবী পুলিশ-সৈন্যরাই মাঝে মাঝে হত্যা করছে শরণার্থীদের। কিছু মানুষ যারা অভাবনীয়ভাবে ক্ষমতা হাতে পেলেন তাঁরা ভাবছেনা ওই অসহায় মানুষগুলির যন্ত্রণার কথা।

কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে লাহোর কংগ্রেসে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, সেই লাহোর শহর পড়ে রইল পাকিস্তানে। আর সেই লাহোর অধিবেশনের সভাপতি জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন বৃটিশ শাসকদের অনুগ্রহে।

স্বাধীনতার পর ভারতের কম্যুনিস্টরা বলেছিলেন, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আমরা তা বলি না। যত ক্ষতির বিনিময়েই আসুক, বৃটিশ শাসনের রাজনৈতিক অপসারণ স্বাধীনতার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তো বটেই;কিন্তু, সেই দুঃখের তিমির রাত্রে যাঁরা হতাহত, নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়ে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতের পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছিলেন, বা সব অত্যাচার সয়ে সশঙ্কভাবে পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের রাত ছিল অশুভ কালরাত্রি। মহাযোগী শ্রী অরবিন্দ কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, খণ্ডিত ভারত আবার অখণ্ড হবেই।

বৃটিশ সরকার তাদের শাসন ব্যবস্থা সরিয়ে নিলেই যে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা পাওয়া সম্পূর্ণ হয় না, তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস দলও কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন প্রজাতন্ত্র দিবস সৃজন করে। সরকারি আনুষ্ঠানিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারিকে ১৫ আগস্টের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাতে বোঝা যায় যে, ১৫ আগস্টই সব পাওয়া হয়নি। এই একই সুর বজায় রেখেই বলা যায় যে, ২৬ জানুয়ারিতেও সব পাওয়া হয়নি। আসলে আমরা প্রায়ই ইতিহাস থেকে ভুল পাঠ গ্রহণ করি। কোনও দেশ বা দেশখণ্ড অবৃটিশ সরকারের হাতে থাকাটাই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা লাভের অধিকার মানুষের কোনও দলের বা গোষ্ঠির নয়। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য জনগণের শুভ, জনগণের মঙ্গল, জনগণের স্বধর্মলাভ। গ্রীক দার্শনিক তথা রাজনীতিবিদ্ অ্যারিস্ততল তাঁর লেখা 'পলিটিকস্' গ্রন্থে বলেছেন, রাষ্ট্র শুভ জীবনের জন্য। জীবনে শুভ আনতে না পারলে ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা তার অর্থ হারায়। কংগ্রেস যাকে জাতির জনক বলে, সেই গান্ধীজীও তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে এখন থেকে একশত বৎসর আগে ১৯০৯ সালেই স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, স্বরাজ আর স্বাধীনতা এক নয়। স্বাধীনতার অর্থ কেবল এই নয়, যে শাসক ভারতীয় হবে, বৃটিশ নয়।

বৃটিশ বিরোধী ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আধুনিক ইতিহাস টিপু সুলতানের কথা বলে। বলে যে বৃটিশ সরকার টিপু সুলতানকে পরাজিত করে মহীশূরকে পরাধীন করে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বলে যে, টিপু সুলতানের পিতা হায়দর আলি, যিনি মহীশূরের হিন্দু রাজার কর্মচারী ছিলেন, তিনি বৈধ নাবালক রাজাকে শাসনচ্যুত করে মহীশূরের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং তাঁর পুত্র টিপু সেই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হন। টিপুর মৃত্যুর পর বৃটিশ কোম্পানী রাজ্যের পশ্চি মাংশের কিছুটা নিজেরা দখলে রাখে, সামান্য অংশ নিজামকে উপহার দেয়, কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ বৈধ রাজবংশকে প্রত্যর্পণ করে। সেই রাজা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না, তাঁকে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, কিন্তু সেই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মহীশূর ভারতের এক অগ্রগণ্য দেশীয় রাজ্য রূপে পরিগণিত হয়। নতুন মহীশূর সরকার টিপুর সরকারের মতো সাম্প্রদায়িক ছিল না। ভারতের তিনটি শিক্ষিত রাজ্যের মধ্যে মহীশূর ছিল অন্যতম, অন্য দুইটি ছিল বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন। এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী। অখণ্ড ভারতের দুইটি নদীবাঁধ পরিকল্পনার মধ্যে একটি ছিল সিন্ধুপ্রদেশের সুক্কুর বাঁধ, দ্বিতীয়টি মহীশূরে অবস্থিত মেত্তুর বাঁধ। তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের একমাত্র ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় মহীশূরের ভদ্রাবতীতে। টিপুর হাতে থাকলে ওইসব প্রজাকল্যাণমূলক কাজের একটিও সম্ভব হত না। বরং স্বাধীনতার পর মহীশূর নিজাম শাসিত হায়দরাবাদের সঙ্গে জোট বেঁধে দক্ষিণে ইসলামী ভারত গড়ার চেষ্টা করত।

স্বাধীনতার অর্থ শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিল ভারতের উত্থানের পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ তাঁর কাছে ছিল বাসুদেবের ভারতবর্ষ। যে বাসুদেবের তিনি দর্শন পান কারাগৃহের অন্তরালে। বিপ্লবীদের আদর্শ স্বরূপ অরবিন্দকে বাসুদেব স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন যে, ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম, ভারতের অন্তরাত্মা ধর্ম, ভারতের সত্ত্বা সনাতন ধর্মেই নিহিত। সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞা করে যে ভারতীয় শাসন, ভারতীয় স্বাধীনতা তা বিজাতীয় স্বাধীনতা।

একশত বৎসর আগে গান্ধীজী তাঁর প্রশ্নকর্তাকে বলেছিলেন, "আপনার ইংরেজী শাসন চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চান, বাঘটি চান না। — তাহা হইলে আর হিন্দুস্থান থাকিবে না, ইংলিশস্থান হইবে। আমি যে স্বরাজ চাহি, এটি তাহা নয়"। — শ্রী অরবিন্দ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেন, সশস্ত্র বিপ্লবের সংস্পর্শ ত্যাগ করে বাসুদেবের পথ গ্রহণ করে। স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর বাণী হল —

"ধর্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক তাঁহার মিলিত হউন, ধর্ম বলে, ত্যাগ বলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম পথে এস"। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই একই কথার প্রারম্ভ করেছিলেন, মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, মা যাহা হইবেন।

দেশমাতৃকা যে ভূখণ্ডমাত্র নন, মাতৃ-অঙ্গ। এই বোধ না থাকার জন্যই দেশভাগ। মাতৃভূমির অংশ যে ইচ্ছামাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, স্বার্থ সাধনের জন্য ছিন্ন করা, দান খয়রাত করা যায় না এই পরম সত্যটিকে না জানার জন্য ভারতের বিভাজন। ধর্মকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য, জাতির জীবন থেকে ধর্মকে অপাংক্তেয় করার জন্য, জগতের সমস্ত জাতির আদর্শ হওয়ার কথা যে ভারতের আজ তা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে। মানুষ জীব জগতের নানা জীবের মধ্যে এক ধরনের জীব। তবু যে মানুষকে জীবশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তার কারণ এই নয় যে, মানুষ হাতি, সিংহ, গণ্ডারের মতো দেহবলযুক্ত, এই কারণেও নয় যে, সে

(এরপর ৪ পাতায়)

"মাতৃভূমির অংশ যে ইচ্ছামাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, স্বার্থ সাধনের জন্য ছিন্ন করা, দান খয়রাত করা যায় না এই পরম সত্যটিকে না জানার জন্য ভারতের বিভাজন। ধর্মকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য, জাতির জীবন থেকে ধর্মকে অপাংক্তেয় করার জন্য, জগতের সমস্ত জাতির আদর্শ হওয়ার কথা যে ভারতের আজ তা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে।"

স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম

(৩ পাতার পর)

সবচেয়ে বেশী বুদ্ধি মান। মানুষ জীব শ্রেষ্ঠ এই জন্যই যে, তার সংস্কার আছে;আহার, নিদ্রা, মৈথুনই তার জীবন দর্শন নয়, প্রকৃত মানুষের জীবন নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা র উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি হল ধর্ম। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সে আর মানুষ থাকে না।

স্বাধীনতা লাভের কালে শ্রীঅরবিন্দ যে ঐতিহাসিক বাণী প্রদান করেন তাতে বলা হয়নি যে, ভারতবর্ষ ভোগ প্রাচুর্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানে যাবে, বর্বর বিলাসে সকলকে অতিক্রম করবে, পশুশক্তিকে গড়ে তুলে অন্য দেশকে অধিকার করবে, শোষণ করবে। তিনি চেয়েছিলেন, সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মুক্তি, যে মুক্তিকে সম্ভব করার জন্য ভারত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ওই বাণীতে তিনি তাঁর চারটি স্বপ্নের কথা বলেছেন — যার প্রথম স্বপ্নটি হলো, এমন এক বিপ্লবের সৃষ্টি যার ফলে ভারতের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে আর সমগ্র ভারতের মুক্তি হবে। দ্বিতীয় স্বপ্ন — সমগ্র এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি হবে। আর মানব সত্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে তার যে মহৎ অবদান ছিল তার সেই ব্রত আবার সে গ্রহণ করবে।

তৃতীয় স্বপ্ন — একটা বিশ্বমিলন, যাকে ভিত্তি করে সমগ্র মানবজাতি একটা সুন্দরতর, উষ্ণতর ও মহ ত্ত র জীবন আয়ত্ত করবে। এই মিলনের পথ এখন প্রশস্ত হয়ে আসছে। সব জাতির স্বার্থের জন্যই এমন একটা ঐক্য থাকা দরকার, কেবল মানুষের পঙ্গুতা ও মূঢ় আত্মপরতাই তা হতে দেয় না, কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজনের বিরুদ্ধে আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রকৃতি বিরোধী জিনিস চিরকাল চলতে পারে না।

আর এক স্বপ্ন, ভারত জগৎকে দেবে তার মহামূল্য অধ্যাত্মজ্ঞান ও জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তোলার সাধনা। এ কাজ শুরুও হয়ে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

শ্রী অরবিন্দের জীবনে দুইটি বিষয়ের অত্যাশ্চ র্য যোগাযোগ। তিনি একই সঙ্গে পেয়েছিলেন ভগবানের সাক্ষাৎ, আর দেখেছিলেন দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি। এই যোগাযোগ ভারতীয় জীবনকে এক ঋজু মার্গদর্শন করায়। সেই মার্গদর্শন হলো মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, সর্বব্যাপী শুভ জীবন এবং বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ হল সমগ্র জীবন, কর্ম ও সাধনাকে সনাতন ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। সমগ্র বিশ্বকে বাসুদেবের রাজত্বে প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার ভাষা, দেশখণ্ড, আকৃতি, গাত্রবর্ণে থাকে না, সমগ্র মানবজাতি বাসুদেবের সৃষ্টি। বাসুদেব তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে নির্মাণ করেছেন। অচেতন পদার্থ বা অন্য জীবকে যা দেননি, সেই ধর্মবোধ, অধ্যাত্মবোধ মানুষকেই দিয়েছেন। বাসুদেবের সেই পরম দানকে তাঁর নির্দিষ্ট পথে ব্যবহার করেই মানুষ আত্মমোক্ষ ও জগতের হিত করতে পারে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায় — শুভের, মুক্তির আনন্দের অন্য কোনও পথ নেই।

তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক

(১ পাতার পর)

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শাহরিয়াতপুর উন্নয়ণ সমিতির কাজে যোগ দেন। তাঁর কাজ ছিল সমিতির দেওয়া ঋণ আদায় করা। এই ঋণের কিস্তি আদায় করে ফেরার পথে স্থানীয় তিন মুসলিম সমাজবিরোধী, মহম্মদ কালাম, বোরহান এবং মতলেব রাধারাণীকে অপহরণ করে। পরে তাঁর নগ্ন মৃতদেহ স্থানীয় হাজির পুকুরের ধারে পাওয়া যায়। রাধারাণীকে গণধর্ষণের পর ইসলামি কায়দায় গলার নলি কেটে জবাই করা হয়েছিল। রাধারাণীর কাছে আদায় করা ঋণের কিস্তির ৪৩,৯৯৬ বাংলাদেশী টাকা ছিল। সেই টাকা দুস্কৃতীরা লুঠ করে নিয়েছিল।

তৃতীয় ঘটনাটি ময়মনসিংহের নন্দাইল এলাকার। স্থানীয় কলেজ ছাত্রী সুন্দরী কলি গোস্বামীর (২০) উপর কু-নজর পড়ে এলাকার মস্তান তোহিদুল ইসলামের। গত ১৩ জুন মধ্যরাত্রে তোহিদুল তার দলবল নিয়ে হানা দেয় গোস্বামী বাড়িতে। বাড়ির দরজা ভেঙ্গে কলির মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা মোটরবাইকে চড়ে গুলি চালাতে চালাতে চলে যায়। গোস্বামী পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। পরিবারের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে মুসলিম প্রতিবেশীদের একজনও সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

এতবড় একটা ঘটনার অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানাতে গেলে কলি গোস্বামীর কাকাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে সংবাদপত্রে ঘটনাটি নিয়ে হৈচৈ হলে নন্দাইল থানা জানায় কলি তোহিদুলকে ভালবেসে স্বেচ্ছায় চলে গেছে। কলি ইসলাম কবুল করতে তোহিদুলকে নিকা করেছে।এই তিনটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে হিন্দুরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বাস করছেন। তাঁদের পরিবারের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করা যাচ্ছে না। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। পশ্চি মবঙ্গের বুদ্ধি জীবী ও সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশে আওয়ামি লীগ ক্ষমতায় আসার পর উল্লাস ও উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছিল। দাবী করা হয়েছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় শেখ হাসিনা তৎপর হবেন। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু নির্যাতনে বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকারের বিশেষ পার্থক্য নেই।

আজও উপেক্ষিত

(১ পাতার পর)

(কৃষ্ণবর্মা) বাসস্থান এবং বর্তমান গুজরাট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংগ্রহশালা নির্মিত হয়েছে তা দেখলাম।

অত্যন্ত সাধারণ গৃহ, যা পুরোনো স্মৃতির নিদর্শনগুলি আজও বহন করে চলেছে। দেখলাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পতাকা এবং 'প্যারিস' থেকে আনা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও তাঁর স্ত্রী ভানুমতির চিতাভস্ম। স্পর্শমাত্রই সমস্ত দেহে দিল এক অপূর্ব শিহরণ। সত্যই ভারতের কৃতী সন্তানের মধ্যে অন্যতম অথচ নেই কোনও প্রচার, নেই আড়ম্বর। তাই মান্ত ভির অন্যতম আকর্ষণগুলি আমাদের কাছে যেন গৌণ মনে হল।

গো-মাংস খাওয়ানো হচ্ছে

(১ পাতার পর)

মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হিন্দু রক্ষা মঞ্চে র পক্ষে শিবলাল ঘোষ বলেন, জাল সেন্ট জেভিয়ার্স নাম দিয়ে অসাধু শহরের কিছু লোকও খৃস্টান মদতপুষ্ট একটি চক্র শহরে এই প্রতিষ্ঠান খুলেছে। সেখান পড়তে আসা সাধারণ ছেলে-মেয়েদের গো-মাংস রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। ঘটনার প্রতিবাদ করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে শহর জুড়ে।

খৃস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জেমস রিংরো বলেন, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। মিথ্যা করে পাড়ার লোকজন প্রচার করছে। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার লক্ষী নারায়ণ মীনা বলেন, হ্যাঁ এই রকম অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীরা রাস্তায় অবরোধ করেছিল। স্থানীয় থানাকে নির্দেশ দিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দারাও হোস্টেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিষয়টি সমাধান করতে বলেছি।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের রাজ্য কমিটির সভার সিদ্ধান্ত পর্বতের মূষিক প্রসব

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতির আঙিনায় দু'টি বড় ঘটনা ঘটে গেল — (১) রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর প্রয়াণ এবং (২) সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির দু'দিন ব্যাপী লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা।

রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী দীর্ঘদিনই অসুস্থ ছিলেন। তবে বেসরকারি হাসপাতালে ২৭ তারিখে ভর্তি হন এবং ৩রা আগস্ট প্রয়াত হন। ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। সুভাষবাবুর পুত্র-কলত্র-কে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। সুভাষবাবু জীবিত অবস্থায় পার্টি নেতৃত্বের একাংশের কাছ থেকে পেয়ে ছিলেন দুয়োরানি-সুলভ ব্যবহার। এখন তাঁর মৃত্যুর পর নেতার কান্না, তাঁকে সংগঠক বলা ইত্যাদি সবই দেখা গেল। সুভাষ-দেহকে সযত্নে টুপি ঠিক করার ছবিও দেখানো হল। এদিকে সুভাষ চক্রবর্তী উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বে না আসতে পারার দরুণ হয়ে উঠেছিলেন বেপরোয়া এবং সব সময়েই পার্টির গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়াটাই তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন পার্টি নেতাদের একাংশকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, অর্ধশিক্ষিত, মুর্খ বলে অভিহিত করতেন, তেমনি সাংবাদিকদেরও অশিক্ষিত মূর্খ বলে থাকতেন। সুভাষ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি মানুষের সাহায্য সহায়তায় এগিয়ে আসতেন । এটা ঠিক, তবে তিনি যে বৃত্ত রচনা করেছিলেন সেই বৃত্তের বাইরে কাউকেই তেমন গুরুত্ব দিতেন না। বস্তুত তাঁর বৃত্তের "ত্রয়ী"ই সব সিদ্ধান্ত ঠিক করতেন — সুভাষবাবু সেটাতে শিলমোহর দিতেন। সুভাষবাবু পার্টি বিরোধী শক্তিদের গোপনে মদত দিতেন বলে অভিযোগ শোনা যেতো। এসব সত্ত্বেও সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পার্টি কোনও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তির কথা ভাবতে সাহস করেনি — কেবলমাত্র নেতৃত্বে উন্নীত হওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল। আসলে সুভাষবাবুকে পার্টি নেতৃত্ব বলবেই বা কোন সাহসে? উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বরাহনগর জুটমিলের মালিক গোবিন্দ সারদা'র সঙ্গে সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই সারদা-দের কারখানার গেস্ট হাউসে পার্টির রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাজেই সারদা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ। সর্বোপরি সিপিএম পার্টির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। কাজেই কে কার দোষ ধরে। তবে যদি বুদ্ধ বাবু এবং সুভাষ চক্রবর্তীর মধ্যে তুলনা করা হয় তবে সুভাষবাবু বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতস্তরের মানুষ। বুদ্ধ বাবু দাম্ভিক উদ্ধত ব্যর্থ প্রশাসক। তিনি "গর্বাচভ" একথা পার্টির একাংশ বলে থাকেন। সুভাষবাবুর প্রয়াণে পার্টির মধ্যে আবার নতুন করে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। সুভাষ অনুগামীরা ইতিমধ্যে সুভাষ অঙ্কিত গেঞ্জি, সুভাষ চিহ্নিত হোর্ডিং লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। সুভাষ গোষ্ঠী "সুভাষ কর্মীদল" গঠন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। এটা সুভাষ জায়ার এন জি ও পথের পাঁচালীর ব্যানারে হবে।

সুভাষবাবুর অবর্তমানে প্রশাসনিক এবং পার্টি সংগঠনের স্তরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুভাষবাবুর পরিবহন এবং ক্রীড়া দপ্তর কাকে দেওয়া হবে সে নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে চিন্তায় ফেলেছে। কারণ যতই কমিউনিস্টরা প্যারোকিয়াল নয় বলে প্রচার করা হোক,

> **লোকসভা নির্বাচনী পর্যালোচনা তথা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটিতে গৃহীত হয়েছে — তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।**

উত্তর ২৪ পরগনার বাইরে যাবার উপায় নেই রাজ্য নেতৃত্বের। আবার মন্ত্রী ঠিক করতে গিয়ে গোষ্ঠীবাজি উপস্থিত হবে। তাই বেলঘরিয়ার মানস মুখার্জি না রণজিৎ কুন্ডু অথবা রবীন মন্ডল — এটাতেও দ্বন্দ্ব। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে সুভাষবাবুর স্থানে কাকে নেওয়া হবে? উত্তর ২৪ পরগণা থেকে নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেকগুলি নাম উঠবে — রবীন মণ্ডল, অমিতাভ নন্দী, তড়িৎ তোপদার, কে পাবেন এই পদ? উত্তর ২৪ পরগণা পার্টি তো দলাদলিতে দীর্ণ। আসলে প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধার শোকার্ত জনস্রোতকে পার্টি কাজে লাগিয়ে "ড্যামেজ কন্ট্রোল" করার ব্যর্থ প্রয়াস নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে সুভাষ চক্রবর্তীর মোমের প্রতিমূর্তি তৈরি হচ্ছে — সেটি তাঁর বাড়িতে স্থাপিত হবে। এইভাবেই বিদেহী সুভাষ চক্রবর্তীকে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে জিইয়ে রেখে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

তবে মন্ত্রী হিসাবে জীবিতকালে সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি এবং মালিকরা বলার আগেই বাস-মিনিবাস ভাড়া বৃদ্ধি করাটা মানুষ আপাতত ভুলে থাকবেন।

রাজ্য-রাজনীতির দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টি হল সদ্য সমাপ্ত সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সভা। এই সভাটির প্রস্তুতি একমাস আগে থেকেই চলেছে। ব্রাঞ্চ থেকে আরম্ভ করে জেলা কমিটিস্তর পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনার সারাৎসার নিয়ে আলোচনার কথা। যা'হোক, দু'দিনের আলোচনা সভায় রাজ্য নেতৃত্ব এবং মন্ত্রিসভার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিটি জেলা থেকে পর্যালোচনা উপস্থিত করেন জেলা সম্পাদকরা। সেই সব পর্যালোচনাতে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়-এর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যা বলা হয়েছে তা এই পত্রিকায় বিভিন্ন সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। যে কথাটা এই সভায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে তা'হল রাজ্য প্রশাসনের শ্লথ গতিকে নিন্দা। লক্ষ্য করার বিষয়, সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু মুজাফ্ফর আহমেদ-এর জন্মবার্ষিকী সভায় প্রশাসনের ধীরে চলার নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এটা আসলে প্রশাসন বনাম পার্টি সংগঠন অর্থাৎ বুদ্ধ বনাম বিমান দ্বন্দ্ব।

বিমানবাবুর মনোভাব হল সরকারি কাজে পার্টির 'গ্রিপ' বাড়ানো। প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিমানবাবুর প্রথম পদক্ষেপ হল বামপন্থী এম-এল-এ-দের রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করানো। বামফ্রন্টের সভায় যখন প্রশাসন সম্পর্কে নীতিগত বিতন্ডা সৃষ্টি হয়, তখনই বিমানবাবু মন্ত্রিসভার কোর কমিটিতে আলোচনার প্রস্তাব দেন এবং তাঁকে সমর্থন জানান ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রবীণ নেতা অশোক ঘোষ। এদিকে কোর কমিটির সভা করাতে চান না বুদ্ধ দেববাবু — কারণ সেখানে তাঁকে কোণঠাসা হতে হয়। বুদ্ধ বাবুর লজ্জা থাকলে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতেন। বিমান-বুদ্ধ দেবের এই মনোভাব রাজ্য কমিটির সভাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এদিকে বিমানবাবু চাইছেন প্রশাসনিক স্তরে পরিবর্তন আর মন্ত্রীরা তাতে বাধা দিচ্ছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র তো একেবারেই বিরোধিতা করলেন। রাজ্য কমিটিতে তীব্র বাদানুবাদের জন্য সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধ-বিমানকে নিয়ে প্রশাসনিক স্তরের পরিবর্তন বা দপ্তর রদবদলের সিদ্ধান্ত করান। এদিকে জেলাগুলির মনোভাবের ফলে বৃদ্ধ অশক্ত অসুস্থ মন্ত্রীদের বাদ দিতে সাহস পেলো না রাজ্য নেতৃত্ব। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রেজ্জাক মোল্লা, সুশান্ত ঘোষ, কান্তি গাঙ্গুলি। এই বিতন্ডার ফলে লোকসভা নির্বাচনী পর্যালোচনা তথা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত রাজ্য কমিটিতে গৃহীত হয়েছে — তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। যেমন রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ল্যান্ডব্যাঙ্ক ল্যান্ডম্যাপ প্রভৃতি কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে না। মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ বলেছেন, বস্তুত তাঁর হাতে কোনও অর্থ এবং কাজ দেওয়া হয়নি।

অন্য রকম

বিমলার সংসার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জীবনের সব দুঃখ যন্ত্রণাই যেন বিমলাদেবীর গা-সওয়া হয়ে গেছে। তিনি জানেন দুঃখ-কষ্ট যার ভবিতব্য, তার কাছে নতুন করে যন্ত্রণা পাওয়ার কিছু নেই। তবুও বিমলাদেবী কখনও জীবনকে বোঝা মনে করেননি। লড়াই করে গেছেন সমানে। অষ্টম শ্রেণী থেকেই জীবন সংগ্রামে লড়াইয়ের সূচনা হয় তাঁর। এইচ আই ভি-র শিকার হন অষ্টম শ্রেণীর বিমলা দেবী। দুরারোগ্য ব্যাধির এই ভাইরাস সেই বয়স থেকে আজও তাঁর শরীরে। কিন্তু বিমলাদেবী ভয় পাননি। বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে কখনও জীবনকে শেষ করে দিতে চাননি। তিনি সর্বদা বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার। স্বপ্ন দেখেছেন সংসারী হবার। মা হওয়ার। সে স্বপ্ন পূরণও হয়েছে তাঁর। নির্দিষ্ট সময়েই বিবাহ হয় বিমলাদেবীর। স্বামী কলকাতায় গাড়ি চালাতেন।

শরীরের দুরারোগ্য ব্যাধি বিমলাদেবীর মনে প্রভাব না ফেললেও, সংক্রমণ ছড়ালো তাঁর সন্তানের মধ্যে। দুই পুত্র ও এক কন্যার মধ্যেও পাওয়া গেছে এইচ আই ভি-র সংক্রমণ। এরই মধ্যে স্বামীও একদিন চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। সংসারের সব দায় গিয়ে পড়ল তাঁর কাঁধে। স্বামীহারা বিমলাদেবী তুলে নিলেন সংসারের দায়িত্ব। গড়ে তুললেন কাপড় তৈরির ব্যবসা। যা রোজগার হয়, তাতে দিব্যি দিন কেটে যায়। একটু আধটু টাকা থেকেও যায়। সন্তানদের সঙ্গে তিনিও লড়াই করছেন এইচ আই ভি পজিটিভের (এইডস্) বিরুদ্ধে।

তবে বিমালদেবী শত দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝেও কখনও ভেঙে পড়েননি। ভেঙে যেতে দেননি নিজের স্বপ্নের সংসারকে। আজ তিনি নিজেই অন্যদের কাপড় তৈরির পাঠ পড়ান। সৎ পথে কষ্টে-সিষ্টে উপার্জন করে দিনপাত করছেন। এইডস্-এর বিরুদ্ধে তিনি আজও লড়ছেন। তাঁর এই ভূমিকা অন্যদেরও প্রেরণা দেয়। পঞ্চায়েত থেকে বিমলাদেবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে — তাঁর এই সংগ্রামী মানসিকতাকে সম্মান জানাতে।

কাপড়ের কাজে বিমলাদেবী।

গান্ধীজী ও দেশবিভাগ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

১৫ আগস্ট দিনটা আমাদের কাছে গৌরবের, কারণ ১৯৪৭ সালের এই তারিখেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। অথচ এই দিনটা দুঃখ ও বিষাদেরও, স্বাধীনতা এসেছিল দেশবিভাজন ও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর রক্ত ও কান্নার মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে দেশবিভাগের ব্যাপারে গান্ধীজীর ভূমিকা একটু নতুন করে বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ এখনও বহু মানুষের ধারণা আছে যে, তিনি আদৌ দেশভাগ চাননি এবং এই ব্যাপারে তাঁর কোনও দায় নেই।

এর কারণ হল — তিনি বারবার জানিয়েছিলেন যে, তিনি দেশভাগের তীব্র বিরোধী এবং লীগের পরিকল্পনার দাবী একটা অবাস্তব ব্যাপার। মৌলানা আজাদকে তিনি বলেছেন — তাঁর মৃতদেহের ওপরেই কংগ্রেস এই দাবী মেনে নিতে পারে — 'If the congress wants to accept partition it will be over my dead body' — (ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম, পৃঃ ১৬৭)। তিনি আরও বলেছিলেন যতক্ষণ তিনি জীবিত আছেন, ততক্ষণ দেশকে বিভক্ত করা যাবে না। ১৯৪৭ সালের তরা মে তিনি একটা প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন — যদি সারা দেশ জ্বলতে থাকে এবং তরবারীর মুখেও দেশভাগের দাবী ওঠে, তবু তা তিনি মেনে নেবেন না।

তাঁর এইসব বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর অনেক ভক্ত ধরে নিয়েছেন যে, তিনি দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর কোনও দায় নেই।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, অনেক সময়ই তাঁর কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন দেশভাগের বিরোধী, কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হয়ে ওঠায় তিনিও দেশভাগের বাস্তবতাটা মেনে নিয়েছেন। এই কারণে ঐতিহাসিক ডঃ এস এস সেন 'হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন — 'Gandhiji's hardened attitute towards partition began to wear away' (পৃঃ ৩৩৫)। এক্ষেত্রে অবশ্য নেহরু-প্যাটেলের চাপ ছিল — কিন্তু তিনি তাঁদের বিরোধিতা না করে বরং তাঁদের পক্ষই নিয়েছিলেন।

ডরোথী নর্মান অবশ্য লিখেছেন যে, শেষদিকে নেহরু-প্যাটেলরা তাঁকে নেপথ্যে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন প্রধান জননেতা। তাহলে একবারের জন্যেও তিনি সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াননি কেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ? দেখলেন না কেন সারা দেশ তাঁর পেছনে আছে কিনা ?

প্রখ্যাত সাংবাদিক দুর্গা পাল তাঁর 'ইন্ডিয়া : ফ্রম কার্জন টু নেহরু' গ্রন্থে লিখেছেন, গান্ধীজী তাঁকে বলেছিলেন — দেশকে ভাগ করতেই হবে, কারণ নেহরু ও জিন্না উভয়েই প্রধানমন্ত্রী হতে চান — একটা দেশেই দু'জন ব্যক্তি কেমন করে প্রধানমন্ত্রী হবেন ?

নেহরুর চরিত্র বোঝা গেল ? কিন্তু সর্দার প্যাটেল ? তাঁর উদ্যোগেই পাঞ্জাবকে ভাগ করার ছকটা তৈরি করেছিলেন ভি পি মেনন। গান্ধীজী ও আজাদ এতে বাধ সাধতে পারেন — এই ভয়ে কংগ্রেস প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিল গান্ধীজী যখন দিল্লীর বাইরে এবং আজাদ নার্সিং হোমে। নেতারা এই বিষয়টা তাঁদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।

বৃদ্ধ গান্ধীজী শিষ্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে চাননি হয়ত। কিন্তু তিনি দেশভাগের দিকে ঝুঁকলেন কেন ? কেনই বা এতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলেন ?

কয়েকটা কথা মনে রাখার মতো।

প্রথমত, একটা সুলিখিত প্রবন্ধে (পি সি রায়চৌধুরীর 'গান্ধী অ্যাণ্ড পার্টিশান, ২৬.৯.৬৮) পেয়েছি — ১৯৪২ সালের ২০ জুলাই গান্ধীজী ফকীর নাজির আমেদকে লিখেছেন যে, তিনি শর্তসাপেক্ষ পাকিস্তান দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। ১৯৮৫ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি লিবারেল নেতা তেজবাহাদুর সপ্রুকে অনুরোধ করেছিলেন পাকিস্তান দাবী নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে একটা সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার জন্যে।

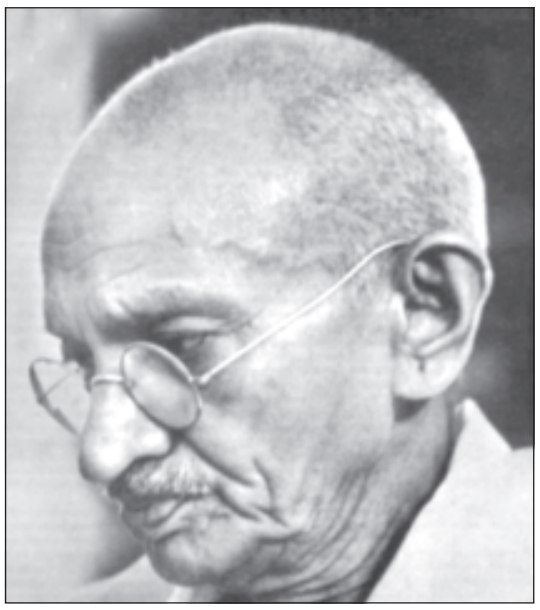

তাহলে এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি দেশভাগের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর সেই পূর্ব ঘোষণার সঙ্গে এই সব চিঠির সঙ্গতি রইল কোথায় ?

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৪ সালে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী একটা সমঝোতা প্রস্তাব ('স্পোর্টিং ফর্মুলা') তৈরি করেছিলেন — তাতে ছিল পাকিস্তানের বীজ, কারণ তাতে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে পৃথক করার একটা ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তৎক্ষণাৎ ১২০/৫ ভোটে এটা বাতিল করে দেয় (মে ১৯৪২)। ডঃ জে সি জোহারীর মতে, এটা ছিল একটা 'Nefarious Design'(ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাক্ট পলিটিক্স, পৃঃ১২৪)। অথচ বিস্ময়ের কথা — গান্ধীজী এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে চিঠির দুটো ছত্রে — 'I have always been a friend and servant of you. Please do not disappoint me.' এই নিয়ে তিনি ১৯৪৪ সালের ৯ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর জিন্নার সঙ্গে বৈঠকও করেছেন, যদিও জিন্নার অনমনীয়তার ফলে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল — পাকিস্তানের ব্যাপার আছে বলে কংগ্রেসই যেটাকে খারিজ করেছে, সেই প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজী এত আগ্রহের সঙ্গে দীর্ঘদিন বৈঠক করেছেন কেন ? ডঃ বি সি রাউতের ভাষায় — 'It was a mistake of Gandhiji'।

তৃতীয়ত, ডঃ নিতাই বসুর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে (পৃ : ২৩৯) পড়েছি — গান্ধীজী নোয়াখালীতে থাকার সময় (৭.১১.৪৬-২.৩.৪৭) একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন — দেশের একটা বড় সম্প্রদায় যদি পৃথক দেশ চায়, তাহলে সেটাই মেনে নেওয়াই উচিত।

তাহলে কেমন করে মেনে নেব যে, তিনি দেশভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন ?

চতুর্থত, শেষ পর্বের নাটকটাও ছিল বেশ জমজমাট। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে এসেই বুঝেছিলেন যে দেশভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই — বিশেষ করে, জিন্না কিছুতেই তাঁর দাবী ছাড়বেন না। সেই জন্য বড়লাটের কাজ হয়ে উঠেছিল দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস নেতাদের বশীভূত করা। প্রথমেই তিনি গান্ধীজীকে আলোচনার টেবিল থেকে সরাতে চেয়েছেন।

গান্ধীজী প্রস্তাব দিয়েছিলেন — জিন্নার হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইংরেজরা চলে যাক। এই অবাস্তব প্রস্তাব শুনে বড়লাট স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কৃত্রিম আগ্রহ দেখিয়ে গান্ধীজীকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং পরে এই নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে রঙ্গ -তামাশাও করেছেন। ফলে কংগ্রেস সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধীজী সরে এসেছেন, আর কখনও বৈঠকে বসেননি। বড়লাটের প্রেস সেক্রেটারি অ্যালান ক্যাম্পবেল জন্সনের ডায়েরীতে (১২.৫.৪৭) আছে — Gandhi has written to Mountbatton that his own plan is not acceptable to congress and that he is personally handling at future negotiation to the working committee (মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ : ৫০)

ধূর্ত বড়লাট এটাই চেয়েছিলেন। লিওনার্ড মস্লের ভাষায় 'The viceroy's clever manoeuvring after his two mettings with the Mahatma had already exited him to the periphery to the congress movement (দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজত্বে পৃ : ১০৬)। কিন্তু গান্ধীজী তো নেহরু, প্যাটেল ইত্যাদির মনের কথা জানতেন। তাঁর উচিত ছিল সেই সঙ্কট সময়ে তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা। কিন্তু তার বদলে বৈঠকী-রাজনীতি থেকে তিনি পালিয়ে গেলেন কেন ? কাদের হাতে দায়িত্ব দিলেন ?

এরপর বড়লাট প্যাটেলকে একটা বৈঠকেই কুপোকাৎ করেছেন। কিন্তু নেহরুকে তিনি গ্রাস করেছেন বিলম্বিতলয়ে — লেডীর মাধ্যমে। মৌলানা আজাদও এই কথা স্বীকার করেছেন (ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম, পৃ : ১৯৮)। নেহরু সম্বন্ধে মস্লে লিখেছেন — 'He had long been a widower and he was a lonely man, Lady Mountbatton filled an important gap in his life' (পৃ : ১০১) ভদ্র ভাষায় আর কী লেখা যায় ? মূলত লেডীর প্রভাবেই নেহরু পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। সেটা এক কলঙ্কিত ইতিহাস।

পঞ্চম মত, ১৯৪৭ সালের ৩ জুন কংগ্রেস ও লীগের নেতারা এবং শিখ নেতা বলদেব সিং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। বড়লাট কিন্তু গান্ধীজীকেও ডেকেছিলেন — তবে তাঁর ভয় ছিল যে, শেষ মুহূর্তে গান্ধীজী সব কিছু বদলে দিতে পারেন। কিন্তু তাৎপর্যের বিষয় হল — বৈঠকে এসে গান্ধীজী এক টুকরো কাগজে লিখে জানালেন সেটা তার মৌন দিবস। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন বড়লাট — 'the viceroy could hardly conceal his relief' (কৃষ্ণ কৃপালনী — গান্ধী, এ লাইফ, পৃঃ ১৭৬-৭৭)। সেই দিনটাকেই গান্ধীজী বেছে নিলেন মৌন দিবস হিসেবে — প্রতিবাদ করার তাঁর আর উপায় রইল না।

এবার শেষ দিনের কথা বলি। ১২ জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং হয়েছে। তাতে ভারত ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ১৪৭/২৯ ভোটে — ৩২ জন ভোট দেননি। মনে রাখতে হবে — গান্ধীজীও প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিয়েছেন। এমন কী ভোটটাও দিয়েছেন (ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ : ২৯৫)। ডঃ কিচনু, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, গিদোয়ানী প্রমুখ নেতা এর বিরোধিতা করেছেন। গান্ধীজী আগে থেকে বিরোধিতা করলে ভোটের ফল অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু তিনি দেশভাগের পক্ষেই ভাষণ দিলেন কেন ? ভোটটাই বা কেন দিলেন দেশভাগ চেয়ে ? অন্তত অন্য ৩২ জনের মতো তিনি নিরপেক্ষ থাকতে তো পারতেন। তাহলেও বলা যেত সেই পাপের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না।

তাঁর জীবনীকার ভিন্সেট শিয়ান 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে জানিয়েছেন, আসলে দেশভাগের ব্যাপারে গান্ধীজী অন্যদের মত প্রকাশে অধিকারের মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি দেশভাগের সমর্থন করেননি — 'but it never received his approval never more than his

(এরপর ১২ পাতায়)

চীন কি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান সত্যিই চায়?

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

একবিংশ শতাব্দী চীন ও ভারতের শতাব্দী বলেই বিশ্ববাসী মনে করেন। বিশাল ভূখন্ড, বিপুল জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তিগত এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি এই মূল্যায়ণের কারণ। রাশিয়া, জাপান, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতের সঙ্গে চীনের কিছু কিছু বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'ইজমের' বিরোধ থাকলেও সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ।

একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া অন্য সমস্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ। চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিবাদই একমাত্র কঠিন সমস্যা হয়ে রয়েছে। তিববত দখল নেওয়ার পর তিববতের সুবাদে চীন অরুণাচলের প্রায় ৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ড তিববত তথা চীনের ভূখণ্ড হিসাবে দাবী করে রেখেছে। দাবী পূরণ করার লক্ষ্যে ১৯৬২-তে অরুণাচল ও লাদাখে সামরিক অভিযানও তারা করেছিল। এর মাত্র কয়েক বছর আগে পাঁচের দশকে চৌ এন লাই ভারতে এসে "হিন্দী চীনি ভাই ভাই'-এর ধুয়ো তুলেছিলেন। বন্ধুত্বের পরিবেশ চিরস্থায়ী করতে "পঞ্চ শীল চুক্তি"ও স্বাক্ষর করে ছিল। বন্ধুর মতো সমস্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। বিশ্বের দুই প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক ভারত এবং চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মেনে চলবে। কিন্তু চুক্তির কালি শুকাবার আগেই চীন তার আগ্রাসী চরিত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রকট করল। চীন আগেই তিববত অধিকার করে নিয়েছিল, ভারত প্রতিবাদ করেনি। এবার ভারত আক্রমণ করল, দালাই-লামা প্রাণ বাঁচাতে সহকর্মীদের নিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। চীন তা ভাল চোখে দেখেনি।

বিগত কয়েক দশকে চীন তার জনবৃদ্ধির হার সীমিত করেছে। শিল্প, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। সে বিশেষ করে নজর দিয়েছে তিববতের দিকে। ভারত-চীন সীমান্ত হিসাবে ম্যাকমোহন লাইন সে মানে না। মূল ভূখন্ড থেকে তিববতে ভারী বাহন চলাচলের রাজপথ এবং রেল লাইন নির্মাণ করেছে। তৈল জাত দ্রব্য নিয়ে যাওয়ার জন্য পাইপ লাইন নির্মাণ করেছে। তিববতের ভিতরে এবং ভারত সীমান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি বড় রাস্তা নির্মাণ করেছে। তার মধ্যে অন্ততঃ ১৫টি ভারি যান চলাচলের যোগ্য। সীমান্তের সমান্তরাল একটি ভাল রাস্তা প্রস্তুত করেছে। তিববতে বিমানবন্দরগুলি উন্নত করেছে। জানা যায়, চুম্বি উপত্যকায় ইয়াটুং পর্যন্ত রেল লাইন ও ভারী যান চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা সে নির্মাণ করছে। মনে রাখা প্রয়োজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর চীন সফরের সময় সিকিম রাজ্যকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে স্বীকার করে নিলেও উত্তর সিকিমে কিছু অঞ্চল চীনের ভূখণ্ড হিসাবে দাবী করে রেখেছে, একইভাবে পশ্চিম ভুটানেরও কিছু অংশ দাবী করে রেখেছে। অরুণাচল, সিকিম ও ভুটানের ওইসব অঞ্চলে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। ইয়াটুং থেকে সিকিম, ভুটানের ওইসব অঞ্চল অত্যন্ত কাছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গ-ভুটান সীমান্তও বেশি দূর নয়। তিববতে এই সমস্ত উন্নয়ণ পরিকাঠামোগত অর্থনৈতিক উন্নতির হিসাবে ধরা হলেও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে ভারতের চিন্তার কারণ। চীন পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র। ক্ষেপনাস্ত্রও তার পর্যাপ্ত। মধ্য চীনের ডেলিংগা এবং দাকাইদাম অঞ্চলে ৫৮টি পরমাণু অস্ত্র সজ্জিত ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নির্মাণ করে রেখেছে। সেইসব ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্য উত্তর-ভারতের বিভিন্ন টার্গেট এবং দক্ষিণ রাশিয়া। রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ সে মিটিয়ে নিয়েছে এবং সেদেশ থেকে সম্প্রতি দশ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র উপকরণ আমদানী করেছে। রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার ক্ষমতা চীন অপেক্ষা অনেক উন্নত। তথাপি চীন মহাকাশে গোয়েন্দা উপগ্রহ ধ্বংস করার ক্ষমতা লাভ করেছে। বিগত দশকে চীন তার ২.৫ মিলিয়ন সৈন্যবাহিনীর আধুনিকীকরণ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে হাইনান দ্বীপে সমুদ্রগুহায় চীন এক বিশাল সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ করেছে যা এতদিন লোকচক্ষুর

অন্তরালে ছিল। সেখানে অন্ততঃ কুড়িটি পরমাণু শক্তি চালিত ও পরমাণু অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র সম্বলিত সাবমেরিন রাখা যাবে। চীনা নৌবহরও সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় অনেক উন্নত হয়েছে। ভারত মহাসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করাই যে এই শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। তিববতে পবিকাঠামো নির্মাণ বিবেচনা করলে বোঝা যায় চীন ভারত সীমান্তের যে কোনও জায়গায় ৪০-৫০ ডিভিসন সৈন্য দ্রুত সমাবেশ করার ক্ষমতা রাখে এবং প্রয়োজনে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সত্বর নিয়ে যাওয়ারও সুবিধা সে করে রেখেছে। এমতাবস্থায় ভারতের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, পরিকাঠামোগত এবং সামরিক প্রস্তুতি অত্যন্তই অপ্রতুল। ভারতের বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের সময় চীন। ভারত সীমান্ত বিবাদ সমস্যার সমাধানের বহুল প্রয়াস করেছেন। চীনও সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের তেমন প্রয়াস করেনি। বরং এমন শর্ত আরোপ করেছে যা ভারতের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। যেমন তাওয়াং চীনকে দিতেই হবে। এটা নাকি তিববতের মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রশ্ন। অথচ দালাইলামা বলেছেন, তাওয়াং চিরদিনই ভারতের ভূখণ্ড ছিল। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ভারত ঋণ চাওয়ায়, চীন তার বিরোধিতা করেছিল, কারণ সেই ঋণের ষাট মিলিয়ন ডলার অরুণাচল প্রদেশে পরিকাঠামো উন্নতির প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে। সামরিক দিক দিয়ে, দাবী অনুযায়ী ভূখণ্ড প্রয়োজনে অধিকারের প্রস্তুতি নিয়ে চীন ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে পাক ভারত বিরোধে চীন শুধুমাত্র পাকিস্তানকে সমর্থনই করছে তা নয়, সামরিক, অসামরিক, নৈতিক সমস্ত বিষয়েই সাহায্য করছে। চীনে প্রযুক্তিগত সাহায্যেই পাকিস্তান পোখরানের জবাবে চাগাই পাহাড় ঘটাতে সমর্থ হল। আজ সে একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র। পাকিস্তানের একিউ খান বিশ্বের পরমাণু প্রযুক্তির কালবাজারিতে পাকিস্তানের মুখও উজ্জ্বল করেছেন। ক্ষেপনাস্ত্র ক্ষেত্রেও সমস্ত মিথাইল প্রযুক্তি চীন তাকে দিয়েছে। পাকিস্তানের গদর নৌবন্দর তারা উন্নত করে তুলছে এবং গদর থেকে মূল চান ভূখণ্ড পর্যন্ত সুদীর্ঘ উচ্চ প্রযুক্তির সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। সীমান্ত বিবাদ মেটাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতীয় ভূখণ্ডও পাকিস্তান চীনকে দান করে দিয়েছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীন পাকিস্তানের প্রধান সমর্থক। ভারত-মার্কিন শান্তিপূর্ণ পরমাণু চুক্তির মাধ্যমে ৪০টি রাষ্ট্রের পরমাণু দ্রব্য সরবরাহ চুক্তির বিরোধিতা করে চীন দাবী করেছিল পাকিস্তানকেও এই সুবিধা দিতে হবে। আবার রাষ্ট্র সংঘের সুরক্ষা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের প্রশ্নে চীন সরাসরি বিরোধ না করলেও বিরোধিতার প্রবক্তা করেছিল পাকিস্তানকে।

বাংলাদেশের সঙ্গে চীন প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে এবং ইরান, পাকিস্তান, মায়ানমার সহ বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান অস্ত্র রপ্তানী কারক দেশ চীন। চিটাগাং বন্দর উন্নয়ণে বাংলাদেশকে সাহায্য করছে এবং বাংলাদেশে প্রথম পরমাণু চুল্লি নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। মায়ানমারে চীন আরও গভীর ভাবে সম্পর্ক বাড়িয়েছে। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও ইরাবতী নদীর নাব্যতা বাড়াতে প্রকল্প রূপায়ণ করছে। বঙ্গোপসাগরে, মায়ানমারের কোকোদ্বীপ তারা ইজারা নিয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে চীন পা রাখার জায়গা করে নিয়েছে।

শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ, মরিসাস ইত্যাদি ছোট ছোট ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রে সে বিভিন্নভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়িয়েছে। ফলে, শুধু সামরিক পরিকাঠামোই নয়, ভারতের চারিদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে ভারতকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রাখার প্রয়াস করছে। উদ্দেশ্য সেই রাষ্ট্রগুলি ভারতের বিরুদ্ধে চীনের পক্ষেই কথা বলবে। ভারত স্থানীয় সমস্যা নিয়েই সর্বতোভাবে ব্যস্ত থাকুক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের প্রভাব খর্ব করতে চীন প্রয়াস চালাচ্ছে। 'এশিয়ান' ও সাংহাই চুক্তি সংস্থায় ভারতের প্রতিনিধিত্বের বিরোধ করেছিল। পরে সাংহাইতে পাকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে ভারতকে পরিদর্শকের ভূমিকা দিতে স্বীকৃত হয়েছে। আগামী দিনে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্কট দেখা দিতে পারে সমগ্র বিশ্বে। চীন সেই সম্পদ সংগ্রহের যারপরনাই প্রয়াস করছে। ইরান, কাজাখাস্তান, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা যেখানেই ভারত তেল উৎপাদন এবং আমদানীর প্রয়াস করছে, চীন সেখানে আরও বেশী দাম দিয়ে বরাত নিয়ে নিচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্যের প্রগতিতে তারা প্রচুর বিদেশী মুদ্রার তহবিল গড়ে এইসব খাতে ব্যয় করছে। এই প্রতিযোগিতা আইনগত ভাবে অবৈধ নয়। কিন্তু কতটা বন্ধুসুলভ তা নিশ্চয়ই প্রশ্নচিহ্ন।

ভারতের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক প্রয়াস ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা মেটাতে তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছেনা। চীন দ্রুত এই সমস্যা মেটাতে তেমন আগ্রহী বলেও মনে হয় না। এই সমস্যা অমিমাংসিত থেকে গেলে ভারতের ভূখন্ড অধিকারে সুযোগ ভবিষ্যতেও আসতে পারে এটাই মনে হয় উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিতে ভারতকে একদিকে কূটনৈতিক প্রয়াস করে যেতে হবে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। এই জন্যই বিশ্বব্যাপি মন্দার বাজারেও ভারতকে অস্ত্র উপকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে। মাত্র কয়েক দিন আগে ভারতের নিজস্ব পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন জলে নেমেছে। সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে আরও দু'বছর লাগবে। রাশিয়ার সাবমেরিন ও আগামী বছর পাওয়া যেতে পারে। বিমানবাহী জাহাজ আসতেও সময় লাগবে। রাশিয়া ক্রমাগত দাম বাড়িয়ে চলেছে। মিগ সিরিজের বিমানগুলিও পুরোন হয়ে গেছে, নতুন যুদ্ধ বিমান আমদানী করতেই হবে। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু দেশের সুরক্ষা ও অখণ্ডতা বলিদান দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সাময়িক স্ট্রাটেজিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সৎ উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিচার্য হয় না। বিচার করা হয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণ, সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি, পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক শক্তি এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ইত্যাদি। সেই অনুসারেই রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয়। আপাতভাবে চীন বন্ধুত্বের শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলছে, কিন্তু ভারত সীমান্তে যুদ্ধ কালীন প্রস্তুতি অন্য তথ্য দিচ্ছে। ভারতকে সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে।

উত্তরপাড়া অভিভ

সনাতন ধর্মই জাতীয়

এই বছর - ২০০৯ শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণের (৩০ মে, আজও জাতীয়তাবাদী দেশবাসীর কাছে প্রেরণার পাথেয়। তাই শ্রীঅরবিন্দে পুরোপুরি প্রকাশ করা হল।

আপনাদের সভার বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে যখন আমাকে বলা হয়, তখন আমার ইচ্ছা ছিল আজকের জন্যে যে বিষয়টি নির্বাচিত — এই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেই দু'একটি কথা বলব। কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা অনুযায়ী চলব কিনা জানি না। কারণ আমি যখন এখানে বসে, তখন আমার মনের মধ্যে একটা বাণী এল; সে বাণী সমস্ত ভারতীয় জাতিকে শোনাতে হবে। এটি প্রথমে আমাকে জেলের মধ্যে শোনানো হয়েছিল, আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি আমার দেশবাসীকে এই বাণী শোনাবার জন্যে।

বছরখানেকের বেশি হল শেষবার এখানে এসেছিলাম। যখন আসি, আমি একা ছিলাম না; তখন জাতীয়তার পরম শক্তিমান গুরু একজন আমার পাশে ছিলেন। যে বাণী তাঁকে বলতে হবে, কারাকক্ষের নৈঃসঙ্গ ও নির্জনতার মধ্যে যাতে তিনি তা শুনতে পান, ভগবান সে জন্যে তাঁকে নির্জনবাসে পাঠিয়েছিলেন; তিনিই তখন বেরিয়ে এখানে এসেছিলেন। দলে দলে আপনারা তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। এখন তিনি বহুদূরে, তাঁর সঙ্গে আজ আমাদের সহস্র সহস্র মাইলের ব্যবধান। অন্যান্য যাঁদের আমি আমার পাশে কর্মরত দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাঁরাও অনুপস্থিত।

দেশের উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেছে তা তাঁদের ইতস্ততঃ বহুদূরে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। এবার আমিই একবছর নির্জনাবাসে কাটিয়ে এলাম; আর আজ বেরিয়ে এসে দেখি, সবই বদলে গেছে। একজন যিনি সর্বদা আমার পাশে বসতেন, আমার সঙ্গে কাজ করতেন তিনি এখন ব্রহ্মদেশে বন্দী, আর একজন উত্তরপ্রদেশে অন্তরীণ অবস্থায় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন।

বেরিয়ে এসে আমি চারিদিকে চাইলাম; উপদেশের জন্যে, প্রেরণার জন্যে যাঁদের দিকে চাইতে অভ্যস্ত ছিলাম তাঁদের সন্ধানে চারিদিকে চাইলাম। তাঁদের দেখা আর পেলাম না। শুধু তাই নয়, যখন আমি জেলে যাই সমগ্র দেশ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে পূর্ণ ছিল, একটা জাতির আশায়, অধঃপতিত অবস্থা থেকে নতুন উত্থিত লক্ষ লক্ষ মানব হৃদয়ের আশায় পূর্ণ ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই ধ্বনি শোনবার জন্যে কান পাতলাম, কিন্তু তখন সব নীরব। দেশের উপরে একটা স্তব্ধতা এসে পড়েছে। সবাই যেন বিভ্রান্ত; কারণ আমাদের সামনে ভবিষ্যতের স্বপ্নে পূর্ণ ভগবানের যে উজ্জ্বল স্বর্গ ছিল, তার পরিবর্তে মাথার উপর যেন এক মেঘাবৃত আকাশ, সেখান থেকে ব্রজ ও বিদ্যুৎ বর্ষিত হচ্ছে। কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে কেউ জানে না, সকল দিক থেকেই এল প্রশ্ন, "এরপর কি করব? কি করতে পারি আমরা?" আমিও জানতাম না, কোন্ পথে চলতে হবে। আমিও জানতাম না, এরপর কি কর্তব্য। কিন্তু এই একটা জিনিস আমি জানতাম, ভগবানের সর্বজয়ী শক্তি যেমন সেই ধ্বনি তুলেছিল, সে আশা জাগিয়েছিল, তেমনি সেই একই শক্তি এই নীরবতাও প্রেরণ করেছে। কোলাহল ও আন্দোলনে ছিলেন যিনি, বিরতি ও নীরবতার মধ্যেও রয়েছেন তিনি। তিনিই আমাদের উপর এটি প্রেরণ করছেন, যেন জাতি ক্ষণকালের জন্যে আত্মসম্বরণ করে, নিজের অভ্যন্তরে সন্ধান করে এবং ভগবানের ইচ্ছা কি তা জানতে পারে। আমি সেই নীরবতায় নিরুৎসাহ হইনি, কারণ কারাগারের মধ্যে নীরবতার সহিত আমার পরিচয় হয়েছিল, আর আমি জানতাম, আমার দীর্ঘবর্ষব্যাপী হাজতবাসে বিরতি ও নীরবতার মধ্যেই আমি নিজে এই শিক্ষা লাভ করেছি। যখন বিপিনচন্দ্র পাল জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তিনি একটা বাণী নিয়ে এসেছিলেন এবং সে বাণী ছিল অনুপ্রেরিত। তিনি এখানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমার মনে আছে। সে বক্তৃতা, তার অর্থ ও উদ্দেশ্য ততটা রাজনৈতিক ছিল না, যতটা তা আধ্যাত্মিক ছিল। তিনি বলেছিলেন, জেলে তাঁর অনুভূতি লাভের কথা, আমাদের সকলের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন, জাতির মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁর কথা, আর তাঁর পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতেও তিনি বলেছিলেন, এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তা সাধারণ শক্তি অপেক্ষা মহত্তর এবং এর সামনে যে লক্ষ্য তা সাধারণ লক্ষ্য অপেক্ষা মহত্তর। এখন আমিও আবার আপনাদের সুমুখে এসেছি, আমিও এসেছি জেল থেকে বেরিয়ে, আর আপনারা উত্তরপাড়ার অধিবাসী, আবার আপনারাই প্রথমে আমাকে অনিনন্দন করছেন, একটি রাজনৈতিক সভায় নয় পরন্তু এমন একটি সমিতির সভায় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ধর্মের সংরক্ষণ। যে বাণী বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে পেয়েছিলেন, ভগবান সেইটিই আমাকে দিয়েছেন আলিপুর জেলে। দ্বাদশ মাস যে আমি জেলের মধ্যে ছিলাম সেই সময়ে দিনের পর দিন তিনি আমাকে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন, আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি এখন সেই জ্ঞানই আপনাদের নিকট প্রকাশ করবার জন্যে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন।

আমি জানতাম, আমি মুক্তি পাব। আমার যে এক বৎসর ব্যাপী অবরোধ তার উদ্দেশ্য ছিল এক বছরের নির্জন বাস ও সাধনা। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যতদিন আমার জেলে থাকা আবশ্যক তার বেশি আমাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে কে? তিনি আমাকে একটি বাণী দিয়েছিলেন, একটি কর্ম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম যতদিন না সেই বাণী উচ্চারিত হচ্ছে ততদিন কোনও মানবীয় শক্তিই আমাকে নিস্তব্ধ করতে পারে না, যতদিন না সেই কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন কোনও মানবীয় শক্তিই ভগবানের যন্ত্রকে নিবৃত্ত করতে পারে না — সে যন্ত্র যতই দুর্বল, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মধ্যে এমন একটা কথা এসেছে যেটি বলবার কোনও ইচ্ছা ইতিপূর্বে আমার ছিল না। আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটি ছিল ভগবান সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর এখন আমি যা বলছি তা একটা প্রেরণা ও বাধ্যতার বশে।

যখন আমি ধৃত হই, তাড়াতাড়ি আমাকে লালবাজার হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিছুক্ষণের জন্যে আমার বিশ্বাস টলেছিল, কারণ ভগবানের ইচ্ছার প্রকৃত মর্ম কি তা আমি তখন বুঝতে পারিনি। সেইজন্যে আমি নিমেষের তরে বিচলিত হয়েছিলাম, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে ডেকে বলেছিলাম, "আমার এ কি হল? আমি ভেবেছিলাম আমার দেশবাসীর জন্যে আমার একটা কাজ করবার আছে, যতদিন না সে কাজ সিদ্ধ হয় ততদিন তুমি আমাকে রক্ষা করবে। তাহলে আমি এখানে কেন, আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন?" একদিন গেল, দু-দিন গেল, তিন দিনও গেল, তখন ভিতর থেকে একটা স্বর শুনতে পেলাম, "অপেক্ষা কর, কি হয় দেখ।" তখন আমি শান্ত হলাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে লালবাজার থেকে আলিপুর নিয়ে যাওয়া হল এবং এক মাসের জন্যে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে একটা নির্জন সেলে আবদ্ধ রাখা হল। সেখানে আমি দিবারাত্রি অপেক্ষা করতে লাগলাম, আমার ভিতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্যে। তিনি আমাকে কি বলতে চান তা জানবার জন্যে, আমাকে কি করতে হবে তা বোঝবার জন্যে। এই নির্জনবাসেই এল আমার সর্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তখন আমার স্মরণ হল, আমার গ্রেপ্তার হবার এক মাস বা আরও কিছু পূর্বে আমার প্রতি একটা আহ্বান এসেছিল সকল কর্ম ছেড়ে দিতে, নির্জনবাসে যেতে এবং নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করতে, যেন আমি ভগবানের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে যোগযুক্ত হতে পারি। আমি ছিলাম দুর্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হইনি। আমার কাজ ছিল আমার নিকট অতিশয় প্রিয়, আর আমার হৃদয়ের অহঙ্কারে আমি মনে করেছিলাম যে, আমি যদি সেখানে না থাকি তাহলে সে কাজের ক্ষতি হবে, এমন কি তা বিফল ও বন্ধ হয়ে যাবে; সেজন্যে আমি তা ছাড়তে চাইনি। আমার মনে হল তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, "যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি, কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় এবং কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যই তোমাকে এখানে এনেছি, তুমি নিজে যা শিখতে পারনি তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরি করে তুলতে।" তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান — রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করলাম, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কি। আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে? অন্যান্য ধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ, কিন্তু সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিষ যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এই ধর্ম দেবার জন্যই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকীরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে।

অতএব তারপর এই জিনিসটিই তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন, হিন্দুধর্মের যা মূল সত্য তা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আমার জেলারদের হৃদয় আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারা জেলের কর্তা ইংরেজ অফিসারকে বললে, "উনি বন্দী অবস্থায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, অন্ততঃ তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা করে তাঁর সেলের বাইরে বেড়াতে দেওয়া হোক।" সেই ব্যবস্থাই হল এবং যখন আমি বেড়াতাম সেই সময় তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক-স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদীদের দিকে আমি চাইলাম — চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেইসব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। এই সব চোর ও ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিল যারা তাদের সহানুভূতি, তাদের স্নেহের দ্বারা আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল, এইসব প্রতিকূল অবস্থার উপর তাদের মানবতা জয়ী হয়েছিল। বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম, আমার মনে হল সে একজন সাধু পুরুষ, সে আমাদের দেশের একজন অক্ষরজ্ঞান-বিহীন চাষা, ডাকাতির অভিযোগে তার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, আমাদের মিথ্যা শ্রেণীর গর্বে যাদের আমরা 'ছোটলোক বলে ঘৃণা করি, সে ছিল তাদের একজন। পুনরায় ভগবান আমাকে বললেন, "দেখ, কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে-জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।"

নিম্ন আদালতে যখন মোকদ্দমা ধরা হল, ম্যাজিস্ট্রেটের সমুখে আমাদের আনা হল, তখনও আমার সঙ্গে গেল সেই নিগূঢ় দৃষ্টি। ভগবান আমাকে বললেন, "যখন তোমাকে জেলে বন্ধ করা হয়, তোমার হৃদয় কি হতাশ হয়ে পড়েনি, তুমি কি আমায় ডেকে বলনি, কোথায় আমার অভয় ছায়া? এখন দেখ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে, সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে।" আমি দেখলাম, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে, দেখলাম বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন নারায়ণ। সরকার পক্ষের উকিলের দিকে তাকালাম, সেখানে আমি সরকারি উকিলকে দেখতে পেলাম না, সেখানে বসে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রিয়, আমার বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন। তিনি বললেন, "কেমন, এখন আর তোমার ভয় আছে? আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে, আমিই তাদের সকল কর্ম, সকল কথাকে নিজের ইচ্ছামতো পরিচালিত করি। আমি এখনও তোমাকে রক্ষা করছি, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার বিরুদ্ধে এই যে মোকদ্দমা আনা হয়েছে, এটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। এ তোমার জন্যে নয়। এই বিচারের জন্যে আমি তোমাকে এখানে আনিনি, অন্য কিছুর জন্য এনেছি। মোকদ্দমাটিও আমার কাজের একটা উপায় মাত্র। তার বেশি আর কিছুই নয়।" পরে সেশন কোর্টে যখন মামলা আরম্ভ হল, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণের মধ্যে কোথায় কি মিথ্যে ছিল এবং সাক্ষীদের কি কি বিষয়ে জেরা করতে হবে সে-সম্বন্ধে আমি আমার উকিলকে নির্দেশ লিখে দিতে লাগলাম। তারপর এমন একটা জিনিস ঘটল যা আমি আশা করিনি। আমার পক্ষ সমর্থনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সহসা তা পরিবর্তিত হয়ে গেল, দেখলাম আর একজন কাউন্সেল আমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছেন। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এলেন — তিনি আমার একজন বন্ধু, কিন্তু আমি জানতাম না যে তিনি আসছেন। আপনারা সকলেই তাঁর নাম শুনেছেন, তিনি তাঁর অন্য সকল ভাবনা সরিয়ে ফেললেন, তাঁর সমস্ত প্র্যাক্‌টিস পরিত্যাগ করলেন, তিনি আমাকে রক্ষা করবার জন্যে মাসের পর মাস ধরে অর্দ্ধরাত্রি বিনিদ্র কাটালেন — তিনি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ। যখন তাঁকে দেখলাম আমি নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু তবুও আমার মনে হল তাঁকে নির্দেশ লিখে দেওয়া দরকার। তারপর সে-সব আমার বন্ধ হল, আমি ভেতর থেকে বাণী শুনলাম, "তোমার পায়ে যে জাল জড়ান হয়েছে তা থেকে এই মানুষটিই তোমাকে উদ্ধার করবে। ওই সব কাগজ ফেলে দাও। তোমার পক্ষে তাকে উপদেশ দিতে হবে না, তাকে উপদেশ দেব আমি।" সেই সময় থেকে মামলা সম্বন্ধে আমার কাউন্সিলকে আমি নিজে একটি কথাও বলিনি, একটিও উপদেশও দিইনি, আর যদি কখনও আমাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি সব সময়েই দেখেছিলাম যে,

ভিভাষণের শতবর্ষ

তীয়তা ঃ শ্রীঅরবিন্দ

ভাষণের (৩০ মে, ১৯০৯) শতবর্ষ। শতবর্ষ অতিক্রম করেও তাঁর সেই বাণী
। তাই শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে শতবর্ষ পূর্বের সেই ভাষণটি এখানে
প্রকাশ করা হল। — স্বঃ সঃ

আমার উত্তরে মোকদ্দমার কোনও সাহায্যই হয়নি। আমি তাঁর উপরেই ভার দিয়েছিলাম এবং সব সম্পূর্ণভাবেই নিজের হাতে নিয়েছিলেন। আর তার ফল কি হয়েছে আপনারা জানেন। আমি সকল সময়েই জানতাম আমাকে নিয়ে ভগবানের কি উদ্দেশ্য ছিল, কারণ আমি বার বার তা শুনতে পেয়েছিলাম, সর্বদা আমি ভিতরে বাণী শুনেছিলাম — "আমি পরিচালন করছি, সুতরাং তুমি ভয় করো না। তোমাকে যে-কাজের জন্যে আমি জেলে এনেছি সেই দিকে তুমি মনোযোগ দাও, আর যখন তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, কখনও আর যেন ভয় করো না, কখনও দ্বিধা করো না। মনে রেখো অমিই এই সব করছি, তুমিও নয় আর অন্য কেউই নয়। অতএব যতই মেঘ ঘনিয়ে আসুক, যত দুঃখ, বিপদ ও দুরূহতা আসুক, যত কিছুই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন, বস্তুতঃ কিছুই অসম্ভব নয়, কিছুই দুরূহ নয়। জাতির মধ্যে, জাতির উত্থানের মধ্যে আমি রয়েছি, আমি বাসুদেব, আমি নারায়ণ, আমি যা ইচ্ছা করি তাই হবে, অপরে যা ইচ্ছা করে তা নয়। আমি যা ঘটাতে চাই, কোনও মানবীয় শক্তিই তা আটকাতে পারবে না।"

ইতিমধ্যে তিনি আমাকে নির্জনবাস থেকে বের করে আমার সঙ্গে অভিযুক্ত অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে রাখলেন। আপনারা আজ আমার স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে অনেক কথাই বলছেন। জেল থেকে বের হবার পর ওই রকম অনেক কথাই আমাকে শুনতে হয়েছে, কিন্তু ওই রকম কথা শুনে আমার লজ্জা হয়, আমার যেন বেদনা হয়। কারণ আমি আমার দুর্বলতা জানি, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির অতীত আমি নই। সে-সব সম্বন্ধে পূর্বে আমি অন্ধ ছিলাম না, আর আমার নির্জনবাসের মধ্যে তারা যখন আমার বিরুদ্ধে জেগে উঠল, আমি তীব্রভাবে তাদের অনুভব করলাম। তখন আমি জানলাম যে, মানুষ হিসাবে আমি একটু দুর্বলতার স্তূপ, দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ যন্ত্র, আমি শক্তিমান হয়ে উঠি কেবল যখন একটা ঊর্দ্ধের শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে। তখন আমি এই সব যুবকদের মধ্যে এলাম, তাদের অনেকেরই মধ্যে দেখতে পেলাম এমন মহতী সাহস, নিজেকে মুছে দেবার এমন শক্তি যার তুলনায় আমি অতি তুচ্ছ। দু-একজনকে দেখলাম, তারা যে কেবল শক্তি ও চরিত্র বলেই আমার চেয়ে বড় শুধু তাই নয়, সেরকম তা অনেকেই ছিল — পরন্তু যে বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্যে আমি গর্ব অনুভব করতাম তার সম্ভাবনাতেও তারা আমার চেয়ে বড়। ভগবান আমাকে বললেন, "এই তরুণের দল, এই নতুন মহা-শক্তিশালী জাতিই আমার আদেশে উঠছে। তারা তোমার চেয়ে বড়। তোমার ভয় কি? যদি তুমি সরে দাঁড়াও অথবা নিদ্রিত হয়ে পড়, তথাপি কাজটি আটকে থাকবে না। কাল যদি তোমাকে সরিয়ে ফেলা হয়, এখানে যে তরুণেরা রয়েছে, এরাই তোমার কর্মভার গ্রহণ করবে। আর তা এমন শক্তির সহিত করবে যা তুমি কখনও পারিনি। তুমি কেবল এই জাতিকে একটা বাণী দেবার জন্যে আমার কাছ থেকে শক্তি লাভ করেছ, যে বাণী তাকে উঠতে সাহায্য করবে।" অতঃপর এই জিনিসটিই তিনি আমাকে বললেন।

তারপর সহসা একটা ঘটনা ঘটল এবং মুহূর্তের মধ্যে আমাকে শশব্যস্তভাবে নির্জন সেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে আমার মধ্যে কি সব ঘটেছিল তা বলবার প্রেরণা আমি পাচ্ছি না, কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, দিনের পর দিন ভগবান আমাকে তাঁর আশ্চর্য ব্যাপার সকল দেখালেন এবং হিন্দুধর্ম যে সম্পূর্ণভাবে সত্য তা উপলব্ধি করালেন। পূর্বে আমার অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয় ছিল। ইংলণ্ডে বিজাতীয় ভাবধারার মধ্যে, সম্পূর্ণ বিজাতীয় আবহাওয়ার মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলাম। আমার একসময়ে মনে হত যে, হিন্দুধর্মে এমন অনেক জিনিসই রয়েছে যা শুধুই কল্পনাবিলাস;মনে হতো যে, তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা শুধুই স্বপ্ন, এমন অনেক কিছুই আছে যা শুধু ভ্রান্তি ও মায়া। কিন্তু এখন দিনের পর দিন আমি মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, শরীরের মধ্যে হিন্দুধর্মের সত্যগুলি উপলব্ধি করতে লাগলাম। সে-সব আমার কাছে জীবন্ত অনুভূতি হয়ে উঠল, আমার সুম্মুখে এমন সব জিনিস উন্মুক্ত হল, জড়বিজ্ঞান যাদের কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারে না। যখন আমি প্রথমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তখন সম্পূর্ণরূপে ভক্তের ভাব নিয়ে যাইনি, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানীর ভাব নিয়েও যাইনি। বহুদিন পূর্বে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক বছর আগে বরোদায় থাকার সময়ে আমি ভগবানকে চেয়েছিলাম এবং আমি দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

সেই সময় যখন আমি ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তাঁর উপর যে আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল তা বলতে পারি না। আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী, নাস্তিক; ভগবান আদৌ আছেন কি না সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না। তত্রাপি কি যেন আমাকে বেদের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অনুভব করতাম যে, এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয়ই আছে। তাই যখন আমি যোগের দিকে ফিরলাম, সঙ্কল্প করলাম যে, যোগ সাধনা করব, দেখব আমার ধারণা সত্য কি না, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। ভগবানকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, "যদি তুমি থাক, তুমি আমার মর্মের কথা জান। তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোনও জিনিসই আমি চাই না। আমি শুধু চাই, এই জাতিটাকে তোলবার শক্তি, আমি শুধু চাই এই যে ভারতের লোক-সকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে জীবনধারণ করতে পাই, কাজ করতে পাই, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।" যোগের সিদ্ধির জন্যে আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি তা কতকটা লাভও করেছিলাম, কিন্তু আমি যেটি সবচেয়ে বেশি চাইতাম তাতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জন সেলের মধ্যে আবার আমি সেইটি চাইলাম। আমি বললাম, "দাও আমাকে তোমার আদেশ। আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে একটা বাণী দাও।" যোগসাধনার ভিতর দিয়ে দুটি বাণী এল। প্রথম বাণীটি হল, "আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিটাকে তুলতে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে;কারণ আমার এই ইচ্ছে নয় যে, এবার তুমি দোষী সাব্যস্ত হও, অথবা অন্যান্যকে যেরূপ তাদের দেশের জন্যে কষ্টভোগ করে সময় অতিবাহিত করতে হবে তুমিও সেরূপ কর। আমি তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, আর তুমি যে আদেশ চেয়েছ তা এই-ই। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, যাও, আমার কাজ কর।" দ্বিতীয় বাণীটি এল এইরূপ — "এই এক বৎসর নির্জনবাসে তোমাকে কিছু দেখানো হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সত্যতা। এই ধর্মটিকেই আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি, ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভিতর দিয়ে এই ধর্মটিকেই আমি সর্বাঙ্গ সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছি আর এখন ইহা যাচ্ছে জগতের জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটিই সনাতন ধর্ম, তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তবিকপক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তোমার মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কারণ আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাহিরে স্থূলে ও সূক্ষ্মে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয় পরন্তু সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে। অতএব যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকে বড় করে তোলা। আমি তোমাকে দেখিয়েছি যে, আমি সর্বত্র সকল মানুষ সকল বস্তুতে বিরাজ করছি, দেখিয়েছি যে, এই আন্দোলনের মধ্যেও আমি রয়েছি, আর যারা দেশের জন্যে কাজ করছে কেবল তাদের মধ্যেই যে আমি কাজ করছি তা নয়, যারা তাদের বাধা দিচ্ছে, তাদের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের মধ্যেও আমি কাজ করছি। সকলের মধ্যেই আমি কাজ করছি, আর লোক যা-ই ভাবুক, যা-ই করুক না কেন, তারা আমার উদ্দেশ্যকে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তারাও আমারই কাজ করছে; তারা আমার শত্রু নয়, তারা আমার যন্ত্র। তোমার সকল কাজের ভিতর দিয়েই তুমি অগ্রসর হচ্ছ, কোন দিকে তা না জেনেই। তুমি এক কাজ করতে চাও কিন্তু করে ফেল অন্য একটা। তুমি একটা ফলকে লক্ষ্য কর কিন্তু তোমার চেষ্টার ফল হয় ভিন্ন, বিপরীত। শক্তি আবির্ভূতা হয়েছে এবং জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বহুদিন পূর্ব থেকেই আমি এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করছিলাম, এখন সময় এসেছে, এখন আমিই একে সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করব।"

তাহলে আপনাদের কাছে এইটিই আমার বক্তব্য। আপনাদের সভার নাম হচ্ছে "ধর্ম- রক্ষিণী সভা"। হাঁ, ধর্মের রক্ষা, জগতের সমুখে হিন্দুধর্মের রক্ষা ও অভুত্থান, আমাদের সামনে এইটিই হল কাজ। কিন্তু হিন্দুধর্ম কি? এই যে ধর্মকে আমরা বলি সনাতন, সর্বকালীন। এই ধর্ম কি? এটি হিন্দুধর্ম, কেবল এইজন্যেই যে, হিন্দুজাতি এই ধর্মকে রেখেছে, হিমালয় ও সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম গড়ে উঠেছে, এই পুণ্য ও প্রাচীন ভূমিতে আর্যজাতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এই ধর্মকে যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়ে রক্ষা করতে। কিন্তু ইহা কোনও একটি দেশেরই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের কোনও একটি সীমাবদ্ধ অংশের জন্যেই বিশেষ ভাবে এবং চিরকালের জন্যে এই ধর্ম নয়। যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি বস্তুত সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম, কারণ সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম, অন্য সকল ধর্মই তার অন্তর্গত। কোনও ধর্ম যদি সার্বজনীন না হয় তবে তা সনাতন হতে পারে না। কোনও সঙ্কীর্ণ ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম, অনুদার ধর্ম কেবল স্বল্পকাল ও সীমাবদ্ধ সামান্য উদ্দেশ্যের জন্যেই জীবিত থাকতে পারে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারা সকলের পূর্বাভাস দিয়ে, তাদিগকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জড়বাদের উপর জয়ী হতে পারে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানবজাতিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়, ভগবান আমাদের কত নিকট, কত আপনার , মানুষ যত রকম সাধনার দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে সবই এর অন্তর্গত। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা প্রতি মুহূর্তে সর্বধর্ম স্বীকৃত এই সত্যটির উপর জোর দেয় যে, ভগবান সকল মানুষ, সকল জিনিসের মধ্যেই রয়েছেন, আর আমরা তাঁরই মধ্যে চলাফেরা করছি, তাঁরই মধ্যে বাস করছি। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা জগৎকে দেখিয়ে দেয় যে জগৎটা কি, এটি হচ্ছে বাসুদেবের লীলা। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে আমরা এই লীলার মধ্যে আমাদের নিজ নিজ ভূমিকা সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে গ্রহণ করতে পারি, দেখিয়ে দেয় এর সূক্ষ্মতম ধারাগুলি কি, এর উদারতম নীতিগুলি কি। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা জীবনকে ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, যা জানে যে অমৃতত্ব কি এবং যা আমাদের মৃত্যুভয়কে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিয়েছে।

এই বাণীটিই আজ আমার মুখে দেওয়া হয়েছিল আপনাদের শোনাতে। আমি যা বলবার মতলব করেছিলাম তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তার বেশী আর একটি কথাও আমার বলবার নেই। আমাকে যে-কথা দেওয়া হয় কেবল সেইটিই আমি আপনাদের বলতে পারি। সে-কথা এখন সমাপ্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে একবার আমার মধ্যে এই শক্তি নিয়ে কথা বলেছিলাম, বলেছিলাম যে, এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তা রাজনীতি নয়, পরন্তু একটা ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আজ আবার আমি সেই কথাই বলছি, কেবল অন্যভাবে। আর আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম একটা নিষ্ঠা;আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে। যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো তা হলে সনাতন ধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হত। সনাতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।

“আমি মনে করি স্বস্তিকার একটা বিশেষ চিন্তাধারা আছে”

(২ পাতার পর)

❑ পুরো বিষয়টায় আমেরিকার ভূমিকা কতদূর?

● আমেরিকার এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে খুব দরকার, ভারতবর্ষের চাইতে বেশি দরকার। এ নিয়ে আমেরিকাকে কটূক্তি করলে চলবে না। কারণ সে তার নিজের স্বার্থটাকে আগে দেখবে। এই যে ওবামা একটা স্ট্রাটেজী বার করেছেন। যেটাকে আফ-পাক বলা হয়। এই স্ট্রাটেজী অনুযায়ী, আফগানিস্তান অংশে মার্কিন সেনা থাকবে, পাকিস্তানে পাক সেনা থাকবে। এরা যৌথভাবে তালিবানদের বিরুদ্ধে কাজ করবে। সমস্যাটা হচ্ছে পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ আর আমেরিকার দৃষ্টিকোণ এই বিষয়ে এক নয়। আমেরিকার দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, তাদের মূল শত্রু হচ্ছে তালিবান। কিন্তু আমেরিকার সহযোগী পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হচ্ছে ভারত। এখানে একটা ডাইভারসন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে, তালিবান সম্পর্কে নিজের নিজের ধারণাটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তালিবানরা দু'প্রকারের, পাক তালিবান ও আফগান তালিবান।

এই আফগান তালিবানদের মূল ঘাঁটি কিন্তু এখন পাকিস্তান। আফগানিস্তানে ওরা ভালোই যুদ্ধ করছে আমেরিকার বিরুদ্ধে, অনেকটা রাশিয়ার বিপক্ষে যেভাবে লড়াই করেছিল, ঠিক সেইভাবেই। ওখানে ওদের ভূমিকাটা অনেকটা মুক্তিযোদ্ধার এবং সেটা স্থানীয় মানুষ মেনে নিয়েছে।

❑ কিন্তু এতে তো আমেরিকার কোনও লাভ হচ্ছে না?

ন হচ্ছে না তো! আমেরিকা সেটা জানে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। কারণ আমেরিকার পুরো রসদ করাচি বন্দরে নামিয়ে পাকিস্তানের মাধ্যমে পেশোয়ার থেকে খাইবার পাস হয়ে আসছে।

❑ কিন্তু আমেরিকান আর্মি তো মাঝেমধ্যেই পাকিস্তানের মধ্যে প্রবেশ করে হামলা চালাচ্ছে। এ নিয়ে পাক-জনগণের মধ্যে ক্ষোভও আছে।

● আছে আছে। দু'পক্ষেরই ক্ষোভ আছে। এটা সোজা নয়। এটা সাদা-কালো নয়। এটা নানা রঙের। সেইভাবেই আপনাদের লেখা উচিত। আপনারা কি লিখবেন জানি না। (ইতিমধ্যে আমাদের একান্তে সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হয়েছেন শঙ্করজায়া। স্বামী, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বিপরীতে সোফায় বসে একান্ত মনোযোগে শুনতে থাকলেন আমাদের কথাবার্তা।)

❑ আপনাকে এটুকু নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি যে আপনার বক্তব্যের কোনও বিকৃতি হবে না।

● ধন্যবাদ। যে কথা বলছিলাম। আমেরিকার পাকিস্তানকে দরকার রয়েছে। পাকিস্তানেরও আমেরিকাকে দরকার রয়েছে। কারণ তারা আমেরিকার থেকে টাকা পাচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। আরেকটা কথা বলি। ভারত আফগানিস্তানে উপস্থিত আছে এবং তা বেশ ভালোভাবেই। রাস্তা তৈরি থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে। ভারতীয় সংস্থাগুলি সেখানে নিয়োজিত হোক এটা পাকিস্তানের একদম ইচ্ছে নয় এবং পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ওই ভারতীয় সংস্থার কর্মীদের ওপর লাগাতার হামলা চালাচ্ছে। পাকিস্তান চায় না ভারতের কোনও অস্তিত্ব আফগানিস্তানে থাকুক। আর আমেরিকা যেহেতু পাকিস্তানকে তাদের সঙ্গে রাখা দরকার, তাই তারাও আফগানিস্তানে ভারতের যে উপস্থিতিটা রয়েছে তা নিয়ে বিরক্ত। আমেরিকা এটা উঁচু গলায় বলতে পারে না কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করে যদ্দিন আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলবে, ততদিন পর্যন্ত ওখানে ভারতের উপস্থিতি খুবই বিরক্তিকর। কিন্তু দেশের স্বার্থে ভারতীয় সংস্থাগুলির ওখানে থাকা উচিত।

❑ এই তালিবানদের সঙ্গে জেহাদকে বিশ্লেষণ করবেন কীভাবে?

● পাকিস্তানে বেশ কিছু জঙ্গি গোষ্ঠী রয়েছে যারা কিন্তু এই তালিবানদের মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে মূল হল লস্কর-এ-তৈবা। যারা বোম্বেতে ২৬/১১-এর ঘটনায় যুক্ত ছিল। লস্করকে চালাচ্ছে আই এস আই। এরা পাক-সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আই এস আই হল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাদা পোষাকের একটা সংস্থা।

❑ এটা কি আপনি মনে করছেন, জেহাদী থ্রেট আর কেবলমাত্র কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে?

● অবশ্যই। সারা ভারতে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে লস্করের শাখা আরও শক্তিশালী ভাবে গড়ে উঠছে। সবচেয়ে চিন্তার কথা আগে ভারতীয় মূলের লোকজনরা এর সঙ্গে যুক্ত হোত। এখন বিদেশী চিন্তাভাবনার লোকরাও এতে যোগদান করছে। এদের কাবু করতে হবে। তবে ঝট করে অ্যাকশন নেওয়া যাবে না, সব ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

❑ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সে দেশে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কিছু প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা গ্রহণ করছে। এ বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন?

● এটা ঠিক। সেদেশের সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা নিচ্ছে, কিন্তু যতটা সম্ভব ঠিক ততটাই নিচ্ছে। এ বিষয়ে আমার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি। শেখ হাসিনা যেবার প্রথম ক্ষমতায় এলেন, তখন ভারত সরকার সেদেশে একটা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যে, শেখ হাসিনা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চান। কিন্তু তার প্রতিদানে ভারত যদি অতি সম্প্রীতি দেখায় তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ চটে যাবে। বি এন পি প্রচার করবে যে, হাসিনা ভারতের দালাল। তো তিনি সেই কারণে বলেছিলেন, আমি এই মুহূর্তে আপনাদের চট করে সাহায্য করতে পারবও না, চাইছিও না। যদি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসি তবে সর্বতোভাবে সাহায্য করব। বি এন পি হলো আই এস আই ও পাকিস্তানের মদতপুষ্ট।

যাই হোক, এবার উনি ক্ষমতায় এসেছেন, বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে। কিন্তু ওনাকে বাংলাদেশের জনতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের অতি উৎসাহী সমর্থনটা তাঁর (হাসিনা) বিরুদ্ধে যেতে পারে। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এখন আর সাদা-কালো বলে কিছু নেই। এভ্রিথিং ইজ্ গ্রে।

❑ আচ্ছা, আজকের দিনে এই যে মাওবাদী হুমকি আমরা শুনতে পাচ্ছি এতে কি চীনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত আছে?

● থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। মাওবাদী হুমকির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ভারতবাসী ও ভারত সরকার। ভারত সরকার কথাটাও আপনি ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখবেন। কারণ, ভারত সরকারেরও নানা রূপ আছে। একটা ভারত সরকার আছে দিল্লীতে। আর বড় ভারত সরকার যেখানে আসল কাজ হয় সেটা রাজ্যস্তরে। দিল্লীতে তবু কাজ চলছে, রাজ্যস্তরে যা একেবারে ফেল। সেটাই মাওবাদী হুমকির আসল কারণ। ১২টি রাজ্যে ১৫৬টি জেলা। বেশীরভাগই আদিবাসী অধ্যুষিত। এদের প্রতি দমন-পীড়নই মাও-হুমকির জন্ম দিচ্ছে। আরেকটা কথা, আজকের দিনে যেটাকে আমরা রেড করিডর বলছি, যা শুরু হচ্ছে নেপাল থেকে এবং ভালোভাবে নোট করুন যে এটা আরও ছড়াচ্ছে। নেপালের প্রচন্ডের কিন্তু চীনের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ আছে। নেপালের মাওবাদীরা স্বাভাবিক ভাবেই এখানে সাহায্য যোগাতে চাইবে। আবার জেহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। ভারতবর্ষকে অস্থির করার জন্য যে মুভমেন্টগুলো তৈরী হয় তার মধ্যে কিন্তু বিদেশী নজর আছে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই চাইবে এদেরকে (মাওবাদীদের) সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষকে অস্থির করে তুলতে, যদিও উভয়ের মতাদর্শে কোনও মিলই নেই।

❑ আপনার কথা থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে পাকিস্তান আমাদের জন্মগত শত্রু। কিন্তু ইদানীংকালে বেশ কিছু বিপদসংকেত চীনের থেকেও কি আসছে না?

● দেখুন, আপনাদের আমি একটা কথা বলি। চীন হলো উপমহাদেশ। ভারতও প্রায় তাই। আমরা চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারি। কিন্তু '৬২-এর পর থেকে চীন চাইছে পাকিস্তানকে মদত দিয়ে আমাদের চাপে রাখতে।

❑ ৯/১১-এর পরে মার্কিন-মুসলিম সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছিল, এ বছরের গোড়ায় মার্কিন প্রশাসনের মাথায় ওবামা আসার পর সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই মনে করা হচ্ছে, পাক-চীন সম্পর্কের মূল্যায়ণও নতুন করে হবে। হয়ত সেই সুসম্পর্কে কিছুটা চিড়ও ধরতে পারে। যাই হোক, ৬৩ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের পাঠকরা জানতে চান ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন কতটা আঁটোসাঁটো?

● নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনও সম্পূর্ণ আঁটোসাঁটো হতে পারে না। সব সময় একটা প্রস্তুতি পর্ব থাকে। তবে সেই প্রস্তুতি কতটা দ্রুত চলছে, তা বলা যাচ্ছে না। কারণ মাঝেমধ্যেই কাগজে পড়ি, আমরা অমুক কিনতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। তবে এর একটাই সমাধান হতে পারে, বাইরে থেকে কিছুই চাই না, যা দরকার দেশেই তৈরি করে নাও। কিন্তু সেই ক্ষমতা আমাদের নেই। তাছাড়া বোফর্স কাণ্ডের পর আমাদের মনে কেনার ব্যাপারে একটা ভয় ঢুকে গেছে। সুতরাং সরকারকে এই নির্ণয় নিতেই হবে, যদি এরকম কোনও কেস ধরা পড়ে তবে তার (অভিযুক্ত) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ট্রায়াল বা অন্যান্য যেমন চলছিল তেমন চলতেই থাকবে। আসলে নিরাপত্তার সব ব্যাপার পাঁচ বছরের মধ্যেই শেষ করে দেওয়া উচিত। এখানে কোথাও চোদ্দ বছর, কোথাও কুড়ি বছর লেগে যাচ্ছে।

❑ ২৬/১১-এর ব্যর্থতাটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

● দেখুন, কার্গিল যুদ্ধের পর দশ-বছর কেটে গিয়েছে। কার্গিল এবং ২৬/১১-এ মুম্বাই-এর ঘটনা দু'টোর কারণ একই। দু'টো ক্ষেত্রেই আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কার্গিলের ঘটনার আগে মেষপালকরা এবং ২৬/১১-এর আগে জেলেরা আগাম সতর্কবার্তা জানিয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কেউই এ বিষয়ে বিশেষ গা করেননি।

❑ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

● আপনারা কি লেখেন তার দিকে আমি সাগ্রহে তাকিয়ে থাকব। কারণ আমি মনে করি, স্বস্তিকার একটা বিশেষ চিন্তাধারা আছে। আপনাদের লেখা মানুষ পড়ে। আপনারা যারা রাজনৈতিক সংবাদদাতা তাদের একটা জিনিস বোঝা উচিত। এখন সব কিছু আর সাদা-কালো ভাবে চলছে না। শত্রুর মধ্যে বন্ধু আছে, বন্ধুর মধ্যেও শত্রু আছে।

❑ অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও (জেনারেল চৌধুরীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে)।

● আপনাদের স্বাগত।

জননায়ক কৃষ্ণ

ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

'কৃষ্ণ' একটি প্রাণ মনোমোহক শব্দ। 'কৃষ্ণনাম' যুগ-যুগান্তর ধরে, বিশেষ করে দ্বাপর যুগ থেকে সারা ভারতে একটি মাত্র জপনীয় নাম।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে, ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এবং ঋগ্বেদ সংহিতার অনেক সূক্তের ঋষিও একজন কৃষ্ণ। অথর্ববেদ সংহিতায় কেশী নামক অসুরকে নিধনকারী কৃষ্ণ বসুদেবনন্দন হিসাবে কথিত। পাণিনীতে বসুদেব পুত্র বাসুদেবই কৃষ্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে —

"তদ্ধৈ তদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়

উক্তিচা উবাচ — অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, আনন্দমসি" অর্থাৎ আঙ্গরস বংশীয় ঘোর নামক ঋষি দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে ভক্তিকৃতে বললেন — "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমিই আনন্দ।"

মহাভারত পর্বে একটি বাণী কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" — কৃষ্ণই ভগবান। কিন্তু ভগবান এবং ঈশ্বর এক নন। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, পার্থিব, ধ্যান-জ্ঞানের অগোচর, সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর আর পর নেই, দ্বিতীয় নেই। কৃষ্ণ ভগবানেরও দ্বিতীয় নেই। কিন্তু তিনি ভগবান, গুণবান, জ্ঞানবানের মত 'বতুপ' যোগে সৃষ্ট শব্দে ভূষিত। তখনই প্রশ্ন ওঠে 'ভগ' মানে কী? ভগ শব্দের একটি অর্থ মাতা মাতৃযোনি, ভগবতী;অপর অর্থ ষড়ৈশ্বর্যবান। ষড়ৈশ্বর্য্য হল মানুষের মধ্যে স্থিত ছয়টি গুণ, যা পূর্ণ জাগ্রত হলেই তিনি ভগবান আখ্যায় খ্যাত হন। যেমন, শ্রী, হ্রী, ধী, বীর্য, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য।

কৃষ্ণ মনোমনোহক সুন্দর, শ্রীমান;তিনি সর্ববিদ্যা বিশারদ ধীমান;তাঁর হ্রী বা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান সর্বোচ্চ, তিনি অমিত বীর্যবান;কংস যখন কৃষ্ণ, বলরামকে বধের জন্য 'ধনুর্মূর্খ' নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যাতে সমস্ত বীরের নিজেদের বীর্য দেখিয়ে মল্লযুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে আপন বীরত্ব দেখাতে পারেন।

কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেই কংসের সুশিক্ষিত হস্তী কুবলযাপীড়কে এবং দুই মল্লবীর চাণুর এবং মুষ্টিককে নিহত করলেন। কৃষ্ণের বীরত্বে ভয় পেয়ে কংস দুই ভাইকে রঙ্গভূমি থেকে বার করে দেবার আদেশ দিলেন, নন্দকে লোহার বেড়ি পরাতে বললেন আর বসুদেবকে নিহত করতে বললেন। চকিতে কৃষ্ণ লাফিয়ে রাজমঞ্চে উঠে কংসের চুল ধরে টেনে নামালেন রঙ্গ ভূমিতে এবং তাঁকে তুলে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন। কৃষ্ণের বীর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল।

কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যবান। তাঁর মথুরা ও দ্বারকায় অতুল ধনসম্পদ। এটি পঞ্চ ম গুণ।

কিন্তু ষষ্ঠ গুণ, যা না থাকলে 'ভগবান' পদবাচ্য হওয়া যায় না, সেই অযাচঞা বৈরাগ্য একমাত্র কৃষ্ণেরই ছিল। তিনি নিজের জন্য কখনও কিছু চাননি এবং সত্যবিচারে পরম আপনজনও যদি অসত্য কাজ, অন্যায় এবং জনবিরোধী কাজ করে, তাহলে তাদের মৃত্যু কামনা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে তিনি অবিমৃষ্যকারী, পাপী, অত্যাচারী, হিংসাপ্রসূত আত্মনিধনকারীদের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বংশ ধ্বংস হতেই প্রবৃত্ত করেছেন। তাঁর সিংহাসনে মথুরায় পিতা বসুদেবকে এবং দ্বারকায় মাতামহ উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করেছেন। নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। তিনি ছিলেন ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ, তিনিই ঈশ্বরের প্রতীক। গীতায় তিনি বলেছেন — "যৎকরোসি, যদশ্নাসি যৎজুহোসি দদমি যৎ। যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম।"

"হে কৌন্তেয়, যা করবে, যা খাবে, যা যজন কর্ম করবে, যা দান করবে আর যা তপস্যা করবে, সবকিছুই আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে অর্পণ করছি বলে মনে করবে।

এই যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনধিকার অযাচঞা এই গুণ একমাত্র কৃষ্ণেরই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন 'গীতা, গীতা বলতে বলতেই ত্যাগী হওয়া যায়।' শ্রীমদ ভগবৎগীতা কৃষ্ণের এই মহান ত্যাগেরই সারমর্ম বর্ণনা করেছে।

অথচ সেই মানবেশ্বর কৃষ্ণকে নিয়ে কত কত কাহিনী, রচনা, উপন্যাস যুগে যুগে রচিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সবের মধ্যেই অলৌকিকতার মোড়ক। তাতে মানবতার আসল বাণী হারিয়ে গেছে ক্রমাগতই।

ননীচোরা কৃষ্ণ, বংশীধারী কৃষ্ণ, ঝুলন রাসের মধ্যমণি কৃষ্ণ, কপট কৃষ্ণ, অথচ কথাকারেরা বাস্তব সত্যটা খতিয়ে দেখেননি, বরং অতিরঞ্জনে ব্যস্ত ছিলেন।

যে শিশু জন্ম মুহূর্তেই মায়ের কোলবঞ্চি ত, চতুর্দিকে হত্যাকারী শত্রু পরিবেষ্টিত, অথচ তার মধ্যে তাঁর প্রাণোচ্ছলতার কোনও অন্ত নেই। একের পর এক ঘটনার পর ঘটনা। নন্দালয়ে থাকাকালে তার শিক্ষা সম্পর্কে কোনও প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। মথুরা বাসকালেও তার শিক্ষা বিষয়ে কোনও উল্লেখ

পাওয়া যায় না। কেবল সন্দীপনি মুনির কাছে শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা করেন। সে যুগে শিক্ষাকে তপস্যা বলা হত। মহাভারতে কথিত আছে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্বতে তপস্যা করেছিলেন। সেটা হয় তো শিক্ষা। ভীষ্ম সভা পর্বের ৩৮ অধ্যায়ে বলেছিলেন,

"বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোহন্যনৃক্তি বিপিষ্টঃ কেশবাদতে।।

কৃষ্ণ বেদ বেদাঙ্গ বিজ্ঞান পারদর্শী।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে কৃষ্ণ অঙ্গিরস বংশীয় ঘোর ঋষির কাছে বেদাধ্যয়ন করেছিলেন।

এইভাবে যদি বিভিন্ন মহাভারত-পুরণাদিতে কৃষ্ণের বিদ্যাধ্যায়নে সময় ব্যয়িত হয়ে থাকে, কৃষ্ণ রাসলীলা, বৃন্দাবনলীলা, গোপিনী বিলাস, তাদের বস্ত্র হরণাদি এবং রাধা-প্রেম করলেন কখন, কি করে? সবচেয়ে বড় কথা, গোটা শ্রীমদ্‌ভাগবতে কোথাও, এমন কী রাসপঞ্চ াধ্যায়েও রাধার নাম গন্ধ নেই হরিবংশ বা মহাভারতেও রাধা নাম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধা উপস্থিত কৃষ্ণের নর্মসঙ্গিনী হিসাবে। কাব্যের নায়িকা, নায়ক কৃষ্ণকে ঘিরে শয্যা-সঙ্গের নানা কামকলার সঙ্গে মানব মহান কৃষ্ণের সম্পর্কের সঙ্গতি কোথায়? যে কাব্যকে "কামগীত" বলা হয়ে থাকে, গীতগোবিন্দের শেষ চার পংক্তিতে জয়দেব নিজেই যে নিন্দাবাদ করেছেন, পণ্ডিতদের কর্তব্য তার রূপক বিশ্লেষণ করে সত্য উদ্ধা র করা। অথচ ভক্ত সম্প্রদায় রাধা ছাড়া কৃষ্ণ কল্পনাই করতে পারেন না। এমনকী আয়ান পত্নীর পরকীয়া প্রেমের নিন্দাবাদ সত্ত্বেও। প্রশ্ন থেকেই যায়, এইসব অর্বাচীন, নিম্নবর্গের কল্পনা কাব্যে ভগবান কৃষ্ণকে কেন জড়িত করা হল। এগুলি যাত্রাতেই মানায়, কৃষ্ণ কীর্তনে নয়।

জননায়ক কৃষ্ণ চিরকাল সত্যব্রতী ছিলেন। মানবদরদী, প্রজানুরঞ্জন রাজধর্ম কেমন হওয়া উচিৎ সেটা কৃষ্ণের চেয়ে বেশি কে জানতেন বা এখনও জানেন? তিনি যেভাবে রাজগুণ, রাজদোষ এবং রাজকর্তব্য সম্পর্কে বলে গেছেন, আজও তা ধ্রুব সত্য, অনুকরণীয় ও পালনীয়। সকলের চিন্তা ও উপলব্ধির জন্য সর্বাগ্রে "রাজদোষ" সম্পর্কে কৃষ্ণ নারদোক্ত যে চৌদ্দটি দোষের উল্লেখ করেছেন, তা সম্যকভাবে তিনি বলেছেন —

নাস্তিক্য, অণৃত বা মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, প্রমাদ বা ভ্রান্তি, দীর্ঘসূত্রতা বা কর্তব্যে অবহেলা, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গত্যাগ, আলস্য চিত্ত চাপল্য বা নীতি নির্ধারণে অস্থিরতা, নিরন্তর অর্থচিন্তা, স্বার্থচিন্তাকারী ব্যক্তির সঙ্গে সলা-পরামর্শ, নিশ্চি ত বিষয়ের কর্ম অনারম্ভ, মন্ত্রগুপ্তির অভাব, মঙ্গল কর্মেও বিমুখতা ও অপপ্রয়োগ এবং অসৎভাবনা। মহাপণ্ডিত বিদুরও এই বিষয়ে বলেছেন —

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পাব।
কৃতমেবাস্য জানান্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে।।

যে সুজনের কর্মচিন্তা ও পরিকল্পনা অন্যে জানতে পারে না, কেবল মন্ত্রকৃত সুকর্মের কথা লোকে জেনে আনন্দিত হয়, তিনিই পণ্ডিত নামে খ্যাত। আজকের জননায়ক মণ্ডলীর জ্ঞাতার্থেই এই রাজদোষ বর্ণিত হল।

রাজগুণ ও রাজকর্তব্য সম্পর্কে ভগবান জননায়ক কৃষ্ণ বলেছেন : — রাজধর্মে নিম্নোক্ত অষ্টবিধ কর্ম রাজ্য রক্ষার্থে ও সুশাসনার্থে একান্ত প্রয়োজন। যেমন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পৌরকর্মাদি, পরিদর্শন, আয়-ব্যয়ের সম্যক পরিচালনা ও পরীক্ষণ, সুশাসক নির্বাচন ও সম্যক শাসন, সেতু পথ, নদী ও দুর্গ সংস্কার এবং প্রজাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি দেখার জন্য জনপদ পর্যবেক্ষণ। কৃষ্ণ দ্বাপর যুগেও "রাজা কর্ণেন পশ্যতি" প্রবাদটির ওপর ভরসা করতেন না। তিনি নিজে সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সত্য সমাচার সংগ্রহ করতেন। তাই তিনি সর্বব্যাপী ওমনিপ্রেজেন্ট।

আমাদের ভারতীয় শাসন কর্তাদের দূরদৃষ্ট যে এই রাজধর্ম কোথাও কদাপি অনুমাত্র পালিত হয় না।

অনারব্ধ এবং আরব্ধ কাজে উপযুক্ত পরিদর্শক ও সৎ পরীক্ষকের অভাবে আজ কোনও প্রজাপালনের কাজই ঠিকমত করা হয় না এবং প্রতি বৎসর রাজকোষ এবং প্রজাদের দেওয়া কর ইত্যাদি ভূরিভোজে অকর্মক ভাবে শূন্য হয়ে যায়। জননায়ক কৃষ্ণকে স্মরণ করতে হলে, প্রাতে উঠে মুন্ডন, তিলক ধারণ খোল করতাল বা আধুনিক উপায়ে কীর্তনের নামে নর্তন কুর্দিনের পরিবর্তে জনানুরঞ্জক বাস্তব কর্মই সবথেকে বেশি প্রয়োজন, এটা আমরা কবে সত্য বলে বুঝতে সক্ষম হব?

রবীন্দ্রনাথের আহ্বান —

"তিনি গেছেন মাঠে যেথায় করছে চাষা চাষ / পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস"। জননায়ক কৃষ্ণের মতো, সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করে জনস্বার্থে সত্যিকারের জনসেবায় আমরা কবে সম্মিলিত হব মিছিলে মিছিলে — পল্লীতে পল্লীতে মানুষকে সস্নেহে, নিঃস্বার্থভাবে বুকে টেনে নিতে? হবো কি?

লেখক : পুরাণ রত্ন উপাধি প্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ

গান্ধীজী ও দেশবিভাগ

(৬ পাতার পর)

possesive acceptance।'

কিন্তু এই দাবী মেনে নেওয়া যায়?

এক সময় গান্ধীজীর সচিব নির্মল কুমার বসু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি আগে কতবার ন্যায়ের জন্য অনশন করেছেন, এবার কেন করবেন না? উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, গরিষ্ঠরা চাইলে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই পারে — এক্ষেত্রে অবশ্য সেই গণতান্ত্রিক রীতিকে আঘাত করত।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই প্রশ্ন তুলেছেন — শিশুদের গণতন্ত্র বোঝানোর জন্য গান্ধীজী অন্য কোনও বিষয় বেছে নিতে পারতেন না? খুঁজে নিলেন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত, কান্না আর মৃত্যুর সঙ্গে ছিল যুক্ত।

সুতরাং একথা বলা উচিত নয় যে, গান্ধীজীর এই ব্যাপারে কোনও দায় নেই, বা তিনি ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছেন। ডঃ সরল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তিনি বরং তাঁর আগের মত বদল করে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান্ মেনে নিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকেও সেটা মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পবিত্র মাতৃভূমির দ্বিখণ্ডীকরণের পাপটা থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না নিশ্চয়। তাঁর অন্ধ-ভক্তরা অতঃপর কি বলবেন?

প্যাটেল, নেহরু, প্রসাদরা ক্ষমতায় বসার উদগ্র আগ্রহে দেশভাগের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন (নেহরু বলেছিলেন, বাংলার পূর্ব ভাগে তো আছে শুধু জল ও জঙ্গল, সেটাকে বাদ দিলে ক্ষতি কি)। কিন্তু গান্ধীজী মোহগ্রস্ত হলেন কেন? ১৯৪৭ সালে নয় — ১৯৪৪ সালেই জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে তিনি দেশভাগকে মেনে নিয়েছিলেন — 'Gandhiji was prepared to accept partition of India'— (ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার — হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খন্ড, পৃ : ৩৭২)।

তখনই ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

এবার তাঁর পরোক্ষ দায়ের কথা বলি। তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন চারবার — ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে। প্রথমটা শুরু করার কিছুকাল পরে তিনি সেটা প্রত্যাহার করেছেন। দ্বিতীয়টা আরম্ভ করার অল্প পরেই সেটা স্থগিত রেখে বড়লাটের সঙ্গে কথা বলেছেন। তৃতীয়টা ছিল এক অর্থহীন ও স্বল্পকালীন ব্যাপার। আর শেষেরটা তিনি শুরুই করতে পারেননি।

প্রথম ও দ্বিতীয়টার মধ্যে ছিল নয় বছরের ব্যবধান আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়'র মধ্যে দশ বছরের। মাঝের এই বছরগুলো কেটেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে। আর সেই নিষ্ক্রিয়তা জড়তাই পরিপুষ্ট করেছে সাম্প্রদায়িকতাকে।

নেতাজী বলতেন, যখন মানুষের সামনে একটা বড় আদর্শ থাকে, তখন অনেক সঙ্কীর্ণ ছোট জিনিসগুলো তুচ্ছ হয়ে যায় — আর তেমন কিছু না থাকলে তখন ছোট জিনিসগুলোই বড় হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয়েছিল জাতিকে সংগ্রামের মধ্যে রাখলে ছোট জিনিসগুলো প্রাধান্য পাবে না। অথচ কংগ্রেসের সেই নিষ্ক্রিয়তাই সাম্প্রদায়িকতাকে তুঙ্গে নিয়ে গেছে — (কৃষ্ণা বসু, ইতিহাসের সন্ধানে, পৃ : ৭৪)। সুভাষ তাই গান্ধীজীকে অবিরত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বলেছেন। কিন্তু গান্ধীজী খুঁজেছেন আপসের পথ।

হরিপুরায় সুভাষ প্রজ্ঞাদৃষ্টির মাধ্যমে একটি অপূর্ব কথা বলেছিলেন — বৈঠকী রাজনীতি করতে গেলে সরকার দেশকে ভাগ করে দিয়ে যাবে (১৯৩৮)। তাঁর ভাষায় — "British ingenuity will seek some other constitutional device for partitioning India.' উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করেছেন আয়ারল্যান্ড ও আরবের — (সিলেক্টেড স্পীচেস, পৃ : ৬৯) কিন্তু গান্ধীজীরা এই কথার তাৎপর্যই বোঝেননি।

কিন্তু সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ও আটটা রাজ্যে সরকার গঠন করাটা। এই নির্বাচনে লীগ সুবিধে করতে পারেনি, এমন কী উত্তরপ্রদেশ

> **"১৯৪৭ সালে নয়, ১৯৪৪ সালেই জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে তিনি দেশভাগকে মেনে নিয়েছিলেন - 'Gandhiji was prepared to accept partition of India'"**

বা বাংলার মতো মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যেও না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লীগ কোয়ালিশানের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাবে তা হয়নি। ডঃ নিমাইসাধন বসু মন্তব্য করেছেন, 'The Congress rejection widened the gulf batseen the two parties. This was utilised to fan the smouldering embers of communalism' — (দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ : ১১২)। হয়ত কোয়ালিশন টিকত না। কিন্তু জিন্নাকে সুযোগ দেওয়া হলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বোঝাতে পারতেন যে, দেশভাগ ছাড়া উপায় নেই। শুরু হল প্রচার যুদ্ধ। লীগ অবিরাম কণ্ঠে অভিযোগ তুলল — কংগ্রেসের শাসিত রাজ্যগুলোতে মুসলমানরা অবহেলিত, অত্যাচারিত হয়ে চলেছেন। বলা চলে — ১৯৩৭ সালের ওই নির্বাচন ও কংগ্রেস নীতি দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছে। এইচ ভি হড্সন তাই লিখেছেন, 'There is no doubt that the conduct of provincial self government from 1937 to 1939 was a major cause of the spread of the two-nation theory and the Pakistan movement' — (দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃ : ৭৫)। অল্পকালের মধ্যেই লীগ লাহোরে প্রস্তাব নিয়েছে দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করতেই হবে (পেণ্ডেরেল মুন — ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট, পৃ : ২১)। এই ধ্বংস ধারাকে রোধ করার জন্য গান্ধীজী কি করেছেন?

ঠিক আছে — লীগকে যদি তাচ্ছিল্যই করা হয়, তাহলে গান্ধীজী জিন্নাকে 'কাযদে আজম (মহান নেতা) বলে উচ্চ মর্যাদা দিলেন কেন? তখন তো জিন্না তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। এমনকী, এক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিলেতে গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। অথচ গান্ধীজী তাঁকে তোল্লাই দিয়েছেন যেমন, তেমনি পাকিস্তান দাবীও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন — (ডঃ জে সি জোহারী, ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ : ১৫৫)।

ক্রীপস মিশন এসেছে, ক্যাবিনেট মিশন এসেছে। সিমলা বৈঠক বসেছে। সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব। বিশেষ করে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান অনুসারে গণ পরিষদ হবে — নেহেরু বলে বসলেন, তাঁরা সেখানে যাবেন শর্ত অনুসারেই, কিন্তু তারপর ইচ্ছে মতো কাজ করবেন। জিন্না এটাকেই কাজে লাগালেন। নেহরুর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচাং লিখেছেন, নেহরুর রাজনৈতিক জীবনে তিনি এত বড় হঠকারিতা আর করেননি (নেহরু, পৃ : ১৫৪)। গান্ধীজী কিন্তু তড়িঘড়ি একটা বিবৃতি দিয়ে ভুলটা মেরামত করেননি।

দেশভাগের দায়টা মূলত জিন্না ও সরকারের। কিন্তু গান্ধীজী বা তাঁর শিষ্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায় এড়াবেন কেমন করে?

অখণ্ড ভারত ভাবনা

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"অখণ্ড ভারত" এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক জ্বলন্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা চার দিক থেকে ছুটে আসে।

(১) অখণ্ড ভারতের সীমা কতখানি ছিল?

(২) কবে থেকে কীভাবে সীমা সঙ্কুচিত হতে লাগল?

(৩) বর্তমানে সীমা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে?

(৪) বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অখণ্ড ভারত কি সম্ভব?

(৫) ভারত,পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলিত হলে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, তাতে নবতর সমস্যার সৃষ্টি হবে না তো?

এই নিবন্ধে আমরা এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজব এবং আশা করি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, অখণ্ড ভারত সম্ভব এবং অখণ্ড ভারত হিন্দু-মুসলমান উভয়ের শান্তি সমৃদ্ধি বিকাশ ও সম্প্রীতির সহায়ক হবে। অখণ্ড ভারত শুধুমাত্র ভারতের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যও অবশ্যম্ভাবী।

এইবার ভারতের সীমা প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক। দ্বাপর যুগে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞের সময় পান্ডব ভ্রাতারা বিশ্বজয় করে মনুষ্যবাসযোগ্য সমগ্র বিশ্বকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের শেষে রাজ্যপ্রাপ্তির পর অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তাঁরা দ্বিতীয়বার বিশ্ব জয় করেছিলেন। এই দু'বার বিশ্বজয়ের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল। যার বহু নিদর্শন আজও বিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান। এখন আমরা দেখব আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা এবং বিদেশী পর্যটকরা ভারতের সীমা সম্বন্ধে কি বলেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "কুমারসম্ভবম্"-এর প্রথম শ্লোকেই ভারতের উত্তর-দক্ষিণের সীমার উল্লেখ করেছেন।

"অস্তি উত্তরাস্যাস্ দিশি দেবতাত্মা হিমালয় নাম নগাধিরাজ।

পূর্বাপরৌ তোয়নিধি বগাহ্য স্থিত পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

হিমালয়ের কৈলাস পর্বতের চূড়াকে দাড়িপাল্লার (মানদণ্ড) খুঁট ধরে কন্যাকুমারিকা থেকে কৈলাস দু-হাজার মাইল এবং কৈলাস থেকে উত্তরে প্রায় সাইবেরিয়া পর্যন্ত দু-হাজার মাইল অর্থাৎ চার হাজার মাইল উত্তর-দক্ষিণে ভারতের সীমার হিসাব পাই। এবার আমরা দেখব গ্রীক পণ্ডিত "মেঘাস্থিনিস" যিনি এশিয়া খণ্ডের গ্রীক সম্রাট সেলুকাসের দূত হিসাবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় (পাটলিপুত্র) ১৪ বছর ছিলেন, তিনি সমগ্র ভারত পর্যটন করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত "ইণ্ডিকা" গ্রন্থে তিনি ভারতের সীমার উল্লেখ করেন। তিনি ভারতের সীমা উত্তর-দক্ষিণে ৩৬০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪০০ মাইল বলেছেন। পূর্ব-পশ্চিমে ব্রহ্মদেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে আফগানিস্তান পেরিয়ে ইরানের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ৩৪০০ মাইল মেলে।

এবার আমরা সীমা সংকোচনের আলোচনায় আসব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পাণ্ডব ভ্রাতাদের মহাপ্রস্থানের পর থেকে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত ২৫০০-৩০০০ বৎসর কালখণ্ডের মধ্যে হিমালয়ের উত্তরের দু-হাজার মাইল আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করা যেতে পারে — "সম্পত্তি বাপের না, সম্পত্তি দাপের"। হিন্দুর যখন দাপ অর্থাৎ পরাক্রম ছিল তখন সম্পত্তি বেড়েছে, আর যখন থেকে হিন্দুর পরাক্রম হ্রাস পেতে আরম্ভ করল তখন থেকে সম্পত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকল। আজ থেকে প্রায় এগার'শ বছর আগে গান্ধার (বর্তমান আফগানিস্তান) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারী কৌরব জননী একথা সর্বজনবিদিত। গান্ধারের বহু পূর্বে পারস্য (বর্তমান ইরান) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতের যে অংশে হিন্দু অল্প সংখ্যক হয়েছে, সেই অংশ ক্রমে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বৃটিশ (ইংরেজ) রাজত্বকালে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে ১৯৩৫ সালে শ্রীলঙ্কা এবং ১৯৩৭সালে ব্রহ্মদেশকে ইংরেজ শাসকরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সময় জাতীয় কংগ্রেস দেশজুড়ে কোনও আন্দোলন করল না কেন? যে কংগ্রেস ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় রূপ দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন করে বৃটিশ সরকারকে ১৯১১ সালে বাধ্য করল বঙ্গভঙ্গ রদ করতে; সেই কংগ্রেস শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশের বেলায় কোনও আন্দোলন না করে চুপ করে থাকল কেন? এটা একটা বিরাট জিজ্ঞাসা। তবে কি সমালোচকদের কথাই মেনে নিতে হবে যে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৃটিশ এজেন্টদের (দালাল) হাতে চলে গেছিল;যারা পরবর্তীকালে দেশ ভাগ পর্যন্ত মেনে নিলেন। এবার আমরা ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি এবং খন্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আলোচনায় আসব। সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের উপর মহম্মদ-বিন-কাশিমের আক্রমণকেই বর্তমান পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সালিমুল্লার নেতৃত্বে লর্ড কার্জনের পৃষ্টপোষকতায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় বড় পদক্ষেপ মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) নেতৃত্বে খিলাফত্ আন্দোলনে গান্ধীজীর আগ্রহে জাতীয় কংগ্রেসকে সামিল করানো। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতৃত্ব খিলাফত্ আন্দোলনে কংগ্রেসকে সামিল করার বিরুদ্ধে ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী কোনও নিষেধ মানলেন না। একতরফা ভাবে কংগ্রেসকে খিলাফত আন্দোলনে সামিল করে দিলেন। কামাল পাশার লোকেদের হাতে তুরস্কের খলিফা নিহত হল। এদেশে খিলাফত আন্দোলনকারী মুসলমানরা রেগে গেল। সাত হাজার মাইল দূর তুরস্কে তো রাগ

দেখাতে যাওয়া যায় না। কাজেই কেরলের সমুদ্রতীরবর্তী মালাবার জেলায় (বর্তমান মাল্লাপুরম্) নিরীহ হিন্দুদের উপর মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, খালিফা হত্যার প্রতিশোধ নিতে (ভাবখানা যেন কেরলের হিন্দুরা খালিফাকে হত্যা করেছে)। হাজার হাজার হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল, ব্যাপক লুঠতরাজ, শত-শত হিন্দু খুন, শত-শত হিন্দু রমণীর সতীত্ব হরণ, সে এক বীভৎস নারকীয় অত্যাচার। সকলে গান্ধীজীর দিকে আঙ্গুল তুললো — দেখুন, আপনার খিলাফত আন্দোলনের পরিণতি। গান্ধীজী তখন বললেন, "Hindus are cowards and Muslim is a bully."হিন্দুরা কাপুরুষ আর মুসলমানরা গুণ্ডা, কাজেই যা হবার তাই হয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত "আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" পাকিস্তান সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বড় কেন্দ্রে রূপান্তরিত হল। মহম্মদ আলী জিন্না প্রথম জীবনে কংগ্রেসে ছিল এবং গান্ধীজীর বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিল। এতে কংগ্রেসের একটি স্বার্থান্বেষী দল জিন্নার পিছনে লাগতে লাগল। জিন্না বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিল। মুসলিম লীগ এতে হাতীর বল পেয়ে গেল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ তাদের লাহোর সম্মেলনে জিন্নার নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবী তুলল। আর সাত বছরের মধ্যে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান আদায় করে নিল। এই দেশভাগের ব্যাপারে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা সম্বন্ধে একটু আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। বৃটিশ শাসকদের মধ্যেও ভারতভাগ নিয়ে দ্বিমত ছিল। চার্চিলের পূর্বসূরী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এট্‌লী ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলকে মুসলিম লীগের দাবী মেনে ভারত ভাগ করা যায় কিনা এই বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তার উত্তরে লর্ড ওয়াভেল জানিয়েছিলেন, "That Divinely designed traingle god has made it one. We can't make it two–it will be a geographical monstrosity."

বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী একথা ঘোষণা করেছিলেন। দেশভাগের সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চার্চিল এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। ওই সময় বৃটিশ সরকার পরপর দুটি মিশন পাঠিয়েছিল, ভারতে স্বাধীনতার বিষয়ে এদেশের নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার জন্য। একটি 'ক্যাবিনেট মিশন' এবং অপরটি 'স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস মিশন' নামে খ্যাত। এই দুই মিশনের কথা মেনে স্বাধীনতা নিলে দেশ ভাগ হত না। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের "One point menifesto"-অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাই। মুসলিম লীগের মেনিফেস্টো "পাকিস্তান চাই"। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনি সমস্ত হিন্দু সমাজকে আহ্বান জানালেন অখণ্ড ভারতের পক্ষে কংগ্রেসকে ভোট দেবার জন্য। নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম লীগকে ভোট দিল। হিন্দুরা কংগ্রেসকে ভোট দিল। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় এল, বাকি ভারতে কংগ্রেসের শাসন হল। ৬ মাস যেতে না যেতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ (জওহরলাল নেহেরু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, পট্টভি সীতারামাইয়া, বলদেও সিং ও বল্লভভাই প্যাটেল) মাউন্টব্যাটেনকে দেশ ভাগের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেই সময় দেশবাসীর সঙ্গে যে বেইমানী বিশ্বাসঘাতকতা করল তার কোনও তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না। নেহেরু বলেছিল, "The idea of Pakistan is a fantastic nonsence."। "জিন্না পাকিস্তানের খোয়াব দেখছে, দেশভাগ হবে না।" গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমাকে দু-টুকরো করার আগে দেশ দু-টুকরো হবে না। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল। দেশে একবার সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনমত যাচাই করার প্রয়োজন মনে করল না। নির্বাচিত প্রদেশ সরকারগুলির মতামত নিল না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে কোনও আলোচনা করল না। এই গেল দেশ ভাগে কংগ্রেসের ভূমিকা। এইবার কম্যুনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তখন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি (সি পি আই) প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের দেশভাগের দাবীর পক্ষে দাঁড়াল। ওদের "পলিটব্যুরো" পাকিস্তানের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে প্রস্তাব পাস করল, যে "কাকাবাবুর" নামে কমরেডরা আজও অজ্ঞান, সেই কাকাবাবু (মুজফ্ফর আহ্মেদ) "মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" নামে বই লিখলেন। তার মূল বক্তব্য ভারতে মুসলমানরা একটি আলাদা জাতি। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের পটে না। পাকিস্তানের দাবী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। কাজেই পাকিস্তান দিতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি তখন ছোট দল। তা সত্ত্বেও তারা কলকাতার রাস্তায় ওই সময় "পাকিস্তান দিতেই হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে" ধ্বনি দিয়ে ছোট ছোট মিছিল বার করত। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মনুমেন্টের নীচে (বর্তমান শহীদ মিনার) মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির এক ঐতিহাসিক যৌথ সভা হয়। সভামঞ্চে লীগ ও কম্যুনিস্টদের ঝাণ্ডা শোভা পেতে লাগল।

(এরপর ১৪ পাতায়)

অখণ্ড ভারত ভাবনা

(১৩ পাতার পর)

উভয় দলের নেতারা কংগ্রেস এবং হিন্দুদের মুণ্ডপাত করে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাষণ দিতে লাগল। সভা শেষে রাত ১২টা থেকে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা নির্বিচারে হিন্দু হত্যা এবং লুঠতরাজে মেতে গেল। এই রায়ট একদিকে মুসলিম লীগের "Direct action" এবং "The great Calcutta killing" নামে ইতিহাসে স্থান পেল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ছত্মত্রচ্ছায় সংগঠন ও শক্তি আজ যেমন বিশাল এবং বিরাট সেই সময় তেমন ছিল না। তখন সঙ্ঘ ছিল ছোট। তথাপি সঙ্ঘের তদানীন্তন প্রধান (সরসঙ্ঘচালক) পরম পূজনীয় শ্রী গুরুজী (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) সমগ্র দেশব্যাপী ভ্রমণ করতে লাগলেন। স্বয়ংসেবক ও দেশের প্রবুদ্ধ নাগরিকদের ওই সমস্যার গভীরতা বোঝাতে লাগলেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে দেশব্যাপী হিন্দুদের সচেতন করতে লাগলেন। বৃটিশ গোয়েন্দারা ইংল্যান্ডে খবর পাঠাল যে ডঃ মুখার্জী এবং এম এস গোলওয়ালকর যদি বেশি সময় পায়, তাহলে দেশ ভাগ করা যাবে না। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশ রাজশক্তি স্বাধীনতা ঘোষণার দিন দশ মাস এগিয়ে আনল। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যাবে এটাই নির্ধারিত ছিল।

কংগ্রেস নেতারা মাউন্টব্যাটেনের কাছে দেশ ভাগের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জেনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে বললেন আপনি দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশভাগ হতে দেবেন না। একমাত্র আপনিই দেশকে বাঁচাতে পারেন। আপনি দেশভাগ অস্বীকার করুন। সমস্ত দেশবাসী আপনার পেছনে দাঁড়াবে। গান্ধীজী সব শুনলেন, কিন্তু চুপ করে থাকলেন। শেষে বললেন, ওরা (কংগ্রেস নেতারা) আমার কথা শুনল না। শ্যামাপ্রসাদ দেখলেন পুরো পাঞ্জাব , পুরো বাংলা পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে। তিনি পাঞ্জাবে গিয়ে আকালী নেতা মাস্টার তারা সিং এবং স্বর্ণমন্দিরের অন্যান্য শিখ নেতাদের বোঝালেন — আপনারা আওয়াজ তুলুন পূর্ব পাঞ্জাব শিখ ও জাঠ অধ্যুষিত, কাজেই পাঞ্জাব ভাগ করে পূর্ব পাঞ্জাবকে ভারতের সঙ্গে মেলাতে হবে। বাংলায় তিনি আওয়াজ তুললেন পশ্চিমবাংলা হিন্দু প্রধান, কাজেই পশ্চিমবাংলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ওই সময় তিনি এক দিনে কলকাতা শহরে ৪০টি স্থানে ঘরোয়া সভা করেছেন। শ্যামাপ্রসাদের বন্ধু এবং সহকর্মী বিখ্যাত ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁকে এই বলে সাবধান করেছেন তুমি 'ড্রাই প্লুরিসির' রুগী, তুমি তো বেঘোড়ে মারা পরবে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ অটল। তিনি বললেন, লোকে আমাকে মানে আমার কথা শোনে, দেশের এত বড় সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, আর আমি স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকব। কি হবে বেঁচে থেকে? তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বললেন যে, তুমি যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেশভাগ করছ, আমি সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পাঞ্জাব ও বাংলার ভাগ চাইছি। জিন্না, লিয়াকত আলীর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন এবং পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবাংলাকে ভারতভুক্তি করালেন। বাঙালী হিন্দুদের কাছে তিনি নমস্য হয়ে রইলেন। এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের সঠিক মূল্যায়ণ আজও হল না।

ভারতের সীমা সঙ্কোচন এখানে শেষ নয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে এক তৃতীয়াংশ কাশ্মীর ছিনিয়ে নিল। আজও সে সমস্যা জ্বলন্ত। ১৯৫৪ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইকে ভারতে আনলেন 'পঞ্চ শীল" চুক্তির জন্য। ভারতের আকাশ-বাতাস "হিন্দী-চীনি ভাই ভাই" ধ্বনিতে মুখরিত হতে লাগল। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রাজগিরে মহাসমারোহে চুক্তি সম্পাদিত হল।

চৌ-এন-লাই বললেন, পঞ্চ শীল তো খুব ভাল কথা, ভগবান বুদ্ধের শান্তি মৈত্রীর কথা। কিন্তু হিন্দী-চীনি স্থায়ী মৈত্রীর স্বার্থে তিব্বতের উপরে ভারতের যে অধিকার ওটা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। দিলদরিয়া নেহরুজী ভারতের সংসদ, মন্ত্রিসভা এবং তিব্বতের ধর্মীয় ও শাসকীয় প্রধান 'দলাই লামার' সঙ্গে কোনওরূপ পরামর্শ ছাড়াই বহুকাল ধরে চলে আসা তিব্বতের উপর ভারতের অধিকার (পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ ও ডাক-তার) এক কথায় চীনের হাতে সঁপে দিলেন। তিব্বত ছিল ভারত চীনের মধ্যে বাফার স্টেট। ভারতের সীমার সঙ্গে চীনের কোনও স্পর্শ ছিল না। নেহরুজীর এক কলমের খোঁচায় দেড়-হাজার মাইল ভারত-চীনের সীমা হয়ে গেল। চীন বলছে ভারত তিব্বত সীমা (ম্যাক-মোহন-লাইন) আমরা মানি না। কাশ্মীরের লাদাখ, অরুণাচল, সিকিম এসব আমাদের। চুক্তির বছর ঘুরতে না ঘুরতে চীনারা দলাই-লামার উপর অত্যাচার শুরু করল। দলাই লামা প্রাণ ও সম্মান বাঁচাতে ভারতে এসে আশ্রয় নিলেন। যুবক বয়সে তিনি তিব্বত ছেড়ে এসেছেন, আজ তিনি বৃদ্ধ। ভগবান বুদ্ধই জানেন দলাই লামা জীবিত অবস্থায় আর তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন কিনা! সীমা সঙ্কোচন এখানেই শেষ নয়। নেহরু-নুন (ফিরোজ-খাঁ-নুন তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী) চুক্তির সময় উত্তরবঙ্গের বেরুবাড়ি মৌজা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গীয় রামপ্রসাদ দাসের (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং তদানীন্তন জনসংঘের সংগঠন সম্পাদক) অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে বেরুবাড়ি মৌজা আজও ভারতে আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের যৌথ প্রয়াসে 'তিনবিঘা' বাংলাদেশকে উপঢৌকন দেওয়া হল।

সীমা সংকোচনের আলোচনা শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সম্রাট অশোকের শাসন কালে ভারতের যে ভূ-সম্পত্তি ছিল, আজ তা এক তৃতীয়াংশে এসে ঠেকেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কিষাণ শহীদ জিতুবাবা ও বুয়াবাগান

ডঃ অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়।। আধুনিক যুগের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহ শ্রমিক আন্দোলন বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে আছে। বলা যেতে পারে কৃষক শ্রমিকের আন্দোলন প্রতিবাদ গোটা বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু আজ থেকে পাঁচ শ'বছর আগে একজন কৃষক-ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিল, কল্পনা করা যায় না। অথচ এই ঘটনাই ঘটেছিল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু তহশীলে। আরও অবাক হতে হয়, যখন শুনি স্থানীয় কৃষকেরা তাকে 'কিষাণ শহীদ' বলে সম্মান দেয়। তার নামে একটা বেদী আছে। আজও কার্তিকী পূর্ণিমায় সেখানে কৃষকদের জমায়েত হয়। তার আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করে বেদীতে ফুল-মালা ধূপ দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

ঘটনাটা ছিল এইরকম —

বিখ্যাত গুহামন্দির বৈষ্ণোদেবী যে পাহাড়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তারই তলায় আগার বলে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে থাকতো জিতমল নামে এক ব্রাহ্মণ। অল্প বয়সে মা- বাবাকে হারিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের কাছেই মানুষ। সময়ে বিবাহ হল। জিত মলের দুর্ভাগ্য, একটি কন্যা সন্তান রেখে তার স্ত্রীও মারা গেল। বৈষ্ণোদেবীর ভক্ত জিতমল কন্যা সন্তানটি নিয়ে নিজের সামান্য জমি- জমা চাষ আবাদ করে দিন কাটায়। এও তার ভাগ্যে সইল না। নানা মিথ্যা ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে তার কাকা তাকে উদ্বাস্তু করে দিল। ছোট শিশু কন্যার হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঝিরি নামের একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছলো সে। জম্মু থেকে দশ -বারো মাইল পশ্চিমে এই ঝিরি। যাকে আমরা এখন বলি "The line of actual control" সেই ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছাকাছি এর অবস্থান। তখন এই গ্রামের বেশির ভাগ অংশই ছিল পাথর বালি কাঁকর আর কাঁটা গাছে ভরা। গ্রামের এক কোণায় স্বল্প সংখ্যক লোকের বাস। কারুরই অবস্থা ভাল নয়। এই পোড়ো জায়গাটার মালিক ছিল মেহেতা বীর সিং। জিতমলের মনে হলো, যদি পরিশ্রম করে এর বালি পাথর কাঁকর সরানো যায়, তবে এই মাটি ভাল ফসল দেবে। জিতমল বীর সিং-এর কাছে গিয়ে ওই জমিতে চাষ বাস করার অনুমতি চাইল। বীর সিং শর্ত দিল, ফসল হলে তার চার ভাগের এক ভাগ তাকে দিতে হবে। রাজি হল জিতমল। তারপর চলল অসাধ্য সাধন। লেঘাসু নামের এক হরিজনকে সঙ্গে নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে কয়েক-সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা চাষযোগ্য করে ফেলল। পরে পরে চাষ হলো, ফসল হলো। সেই ফসল কেটে, বীর সিংকে জানালো তার ফসলের ভাগ দেখে নিয়ে যেতে। বীর সিং এসে দেখলো জিতমল প্রচুর ফসল ফলিয়েছে। জমিদারের সাধারণ চরিত্র যেমন হয়, বীর সিং তার ব্যতিক্রম নয়। যে চারভাগের এক ভাগ তার পাওয়ার কথা ছিল, পরিবর্তে সে চারভাগের তিন ভাগ দাবী করল। জিতমল বলল, তার সঙ্গে কথা হয়েছে চার ভাগের এক ভাগ দেবার, সে তাই দেবে, এর বেশি চাওয়া অন্যায়। রাগ চড়ে গেল বীর সিং-এর। তার লোকজনদের হুকুম দিল সমুহ ফসল তুলে নিয়ে যেতে। জিতমল নাকি অন্যায়ভাবে তার জমি চাষ করছে। লোকজন তৈরি হল ফসল নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিতমল স্থির হয়ে চারদিক দেখে নিয়ে কোমরে গোঁজা ধারাল দা-খানা বের করে সজোরে নিজের ঘাড়ে বসিয়ে ফসলের স্তূপের উপর লুটিয়ে পড়লে। বীর সিংসহ লোকজন হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জিতমলের তোলা ফসল তারই রক্তে ভিজে যেতে লাগল। ক্রমে জিতমলের দেহ স্থির হয়ে গেল। বীর সিং কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গুণছে। ব্রহ্ম হত্যার পাপ তাকেই তো লাগবে। তাছাড়া সমাজ তাকে এরপর থেকে ঘৃণা করবে, সাত পাঁচ ভেবে সঙ্গের লোকজনকে রক্তে ভেজা ফসলগুলিকে চেনাব নদীতে ভাসিয়ে দিতে হুকুম দিল। বীর সিং তার নিজের মহল্লায় থাকতে পারল না। ব্রহ্ম হত্যার পাপের ভয়, লোকলজ্জার ভয় — এবং মনস্তাপে দেশ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল — কেউ তার হদিশ জানল না। স্থানীয় গরীব চাষীদের উপর জবরদস্তি করার কেউ রইল না। অন্যদিকে জিতমলের ছোট্ট কন্যাটি পুকুরের জলে ডুবে মারা গেল। এতসব একসঙ্গে ঘটতে দেখে হরিজন লেঘাসুও আত্মহত্যা করল।

স্থানীয় কৃষকেরা তাদের মুক্তিদাতাকে স্মরণ করতে জিতমলের আত্মোৎসর্গের জায়গাটিতে একটি বেদী তৈরি করল। প্রতি কার্তিকী পূর্ণিমায় আজও ফুল-মালা-ধূপ দিয়ে স্মরণ করে জিতমলকে। এখন তার নাম জিতমল নয়, জিতুবাবা।

মজার কথা হলো — জিতুবাবার বেদীতে ফুল-মালা চড়াতে গিয়ে যে পুকুরে তারা স্নান করে, তাতেই ডুবে গিয়েছিল জিতমলের মেয়ে। সেই ডুবে যাওয়া ছোট্ট মেয়েটিকে স্মরণ করতে আগত যাত্রীরা পুকুরের পাড়ে অনেক পুতুল রেখে আসে। পাঁচশ বছর আগের এই কিষাণ শহীদ এখনও এই জনপদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কিষাণ শহীদ বুয়া বাগান

এই ঘটনাও প্রায় পাঁচশ বছর আগের। ঘটনাস্থল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু তহশীলে। বুয়া-বাগান একজন মহিলা। ইনি কিন্তু কোনও কৃষক ছিলেন না। যাকে আমরা জোতদার বলি ইনি তাদেরই মতো একজন। কিছু কিষাণ তাঁর জমি জমা চাষ করতো। ভাগ মতো তিনি তাঁর ভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিষাণদের সঙ্গে তাঁর আপনজনের সম্পর্ক। জম্মুর বিখ্যাত রাস্তা — ধার উধমপুর। এই রাস্তার পাশেই থেরা কালওয়ালের বাসিন্দা বুয়া বাগান, ব্রাহ্মণ কন্যা। জায়গীরদার বাধু, জোতদারদের কাছ থেকে রাজস্ব পেত। জোতদার চাষীদের কাছ থেকে পেত ফসলের ভাগ। কিন্তু হঠাৎ বাধু চাইল কেবল জোতদার নয়, কিষাণদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ খাজনা সে আদায় করবে। গরীব চাষীরা জানত বাধুর হাতে এবার তাদের যথাসর্বস্ব যাবে। তারা সবাই এক সঙ্গে এসে বুয়া বাগানের কাছে আপত্তি জানাল। সব শুনে বুয়া বাগান তাদের বললেন — কেউ যদি সরাসরি তোমাদের কাছে খাজনার জন্য আসে তবে বলে দিও আমি তোমাদের খাজনা দিতে না বলেছি। বাধুর লোকজন এলে তারা বুয়া বাগানের পরামর্শ মতোই তাদের সঙ্গে কথা বললো। রাগে জ্বলে উঠল বাধু। একে সামান্য জোতদার তার উপর মহিলা। তখনই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে লোকজন পাঠাল। এমনই হুকুম দিল যদি আমাদের কথামতো না চলে তবে তাকে যেন ধরে আনা হয়। প্রস্তুত ছিলেন বুয়া বাগান। উনি জানতেন ওঁর উপর অত্যাচার শুরু হবে। তাই আগে থেকে একটা কুন্ড তৈরি করালেন। তাতে জ্বালিয়ে রাখলেন দাউ দাউ আগুন। এমন সময় এল বাধুর লোকজন। বুয়া বাগান নিজের কথায় অনড় রইলেন। বললেন বেশি কর নিতে হলে আমার কাছ থেকে নিতে হবে। আমি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কিষাণদের কাছ থেকে সরাসরি কর নেওয়া চলবে না। বাধুর লোকজন এগিয়ে গেল তাঁকে ধরতে। বুয়া চেঁচিয়ে বললেন — দূর থেকে কথা বলো, আমাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু ওরা এগিয়েই চললো। কাছাকাছি আসতেই বুয়া ধারাল দা দিয়ে এক ঘা মারলেন নিজের ঘাড়ে, আর এলিয়ে পড়লেন সেই দাউ দাউ অগ্নি কুণ্ডে। চোখের পলকে এঘটনা ঘটে যেতে, লোকজন ভয়ে পালিয়ে গেল, বাধু জায়গীরদারও বিপদ বুঝে কর তুলে দেওয়ার হুকুম দিল। আরও হুকুম দিল বুয়া বাগানের কিষাণদের কাছ থেকে বাধু কোনও কর নেবে না। নিজের সম্পত্তির মতোই ভোগ দখল করবে। যে কোনও কারণেই হোক বাধু এবং তার পরিবারের উপর পর পর বিপর্যয় নেমে এল। বাধুও বীর সিং-এর মতো ভাবল এ ব্রাহ্মণ কন্যা হত্যার ফল। কিছুদিনের মধ্যে বাধু কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

চাষীরা তাদের মালকিন্‌কে স্মরণে রাখতে সেই অগ্নিকুন্ডের উপরই একটা বেদী গড়ল। সেখানে এখনও প্রতি জুন মাসে কৃষকের জমায়েত হয়। তাদের মুক্তিদাত্রী হিসাবে স্মরণ করে ফুলমালা ধূপ-দীপ দেয়। চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ি ভোগ দেয়, এমনি করে এখনও সেখানে শহীদ অর্পণ চলে আসছে। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে চাষের জন্য চাষীদের জন্য, এই আত্মোৎসর্গ আমাদের অবাক করে।

[JAMMU SHRINES & PILGRIMAGES by J. N. GANHAR পুস্তকের SAINT MARTYRS SHRINES অধ্যায় অবলম্বনে]

স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী সিধু-কানহু

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

সৃজনশীলতায় অনবদ্য, পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

প্রবন্ধ
প্রণব রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
তথাগত রায়
সুমিত চক্রবর্তী
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
দীনেশচন্দ্র সিংহ
বলরাম চক্রবর্তী
নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

উপন্যাস
সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
সুমিত্রা ঘোষ
দীপঙ্কর দাস
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
● রমানাথ রায় ● শেখর বসু ● এষা দে ● গোপালকৃষ্ণ রায় ● দীপক চন্দ্র, ● জিষ্ণু বসু প্রমুখ

রম্যরচনা ঃ চণ্ডী লাহিড়ী ● ছড়াকাহিনী ঃ শিবাশিস দণ্ড ● দেবী প্রসঙ্গ ঃ স্বামী অশোকানন্দ

সত্বর কপি বুক করুন ● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

Swastika
17 August - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

"To me personally it must naturally be gratifying that this date which was notable only for me because it was my ovn birthday celebrated annually by those who have accepted my gospel of life, should have acquired this vest significance. As a mystic, I take this identification, not as a cioncidence or fortuitous accident, but as a sanction and seal of the Divine Power which guides my steps on the work with which I began life."

The spiritual gift of India to the world has already begun. India's spirituality is entering Europe and America in an ever increasing measure. That movement will grow; amid the disasters of the time more and moer eyes are turning towards India with hope and there is even an increasing resort not only to her teachings, but to her phychic and spiritual practice."

-- Sri Aurobindo

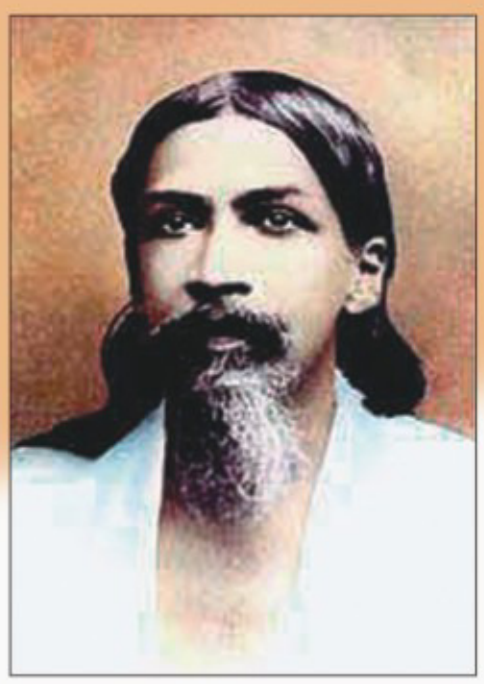

Balkrishna K. Shukla
Member of Parliament
Mayor, Vadodara

It gives me immense pleasure to learn that the "SWASTIKA" weekly published in Bengali from Kolkata since 1948 and circulated in Gujarat, West Bengal, Assam, Tripura etc.

On the auspicious occasion of our Independence Day 15th August, I convey my best wishes and congratulate all the Indians.

15th August is also the birthday of Great Son of Bharat Mata "Rishi Aurobindo". In the life of Sri Aurobindo, Baroda city contributed very important role.

On the eve of our Independance day, Sri Aurobindo has given a message to the society which is enlighting our life.

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com